গান	শ্রীসুবোধ চন্দ্র রায়	৬৬৯
ঐ	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল	৭৮০
গুরুদেব	শ্রীবীণাপাণি দেবী	৬৯
গুরুশিষ্য (কবিতা)	শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী	৪৮৭
গোপন কথা (কবিতা)	শ্রীগিরিজাকুমার বসু	১০৬৮
	চ	
[illegible] দেশ বাঁচবে	শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ	১১৪
চাক্‌রের ছুটী	শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	৫৪০
চিঠির গুচ্ছ	শ্রীশচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত	৪৬৮, ৬৬৬, ৭০০,৮৩৯,৮৯৬, ৯৭১, ১১২০, ১১২০, ১১৭৭
চিত্র	শ্রীঅনাথ নাথ বসু	১১০
চিত্র পরিচয়	......	৭৬৮
চির অভিসার (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	৪৯
	ছ	
ছায়ানট (কবিতা)	কাজী নজরুল ইস্‌লাম	৩৩৩
	জ	
জগৎ জুড়ে ইঙ্গিত	শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ	১০৭৭
জড় বিজ্ঞান ও জীবাত্মা	শ্রীঅতুল চন্দ্র দত্ত	৩৮৬, ৪৫৫
জাগৃহি (কবিতা)	শ্রীশ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ	৮৩৮
জাতীয়তা ও দেশ	অধ্যাপক শ্রীমোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায়	৫৯৫
জাতীয় শিক্ষার গৌরচন্দ্রিকা	শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ	৫৫৪, ৭২৮
জিউ জিৎসু	শ্রীহেম সেন	১২৪০
জীবন তরী (কবিতা)	শ্রীবিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়	১৫৬
জীবনের পথে	শ্রীঅনাথ নাথ মুখোপাধ্যায়	৩১৩
	ট	
টঙ (কবিতা)	দরবেশ	৪৪৯
	ড	
ডাক (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বি, এল,	২৯৬
ঐ	শ্রীসরসীকান্ত দত্ত বি, এ,	৫৯৪
	ত	
তগদত্ত (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	১৩৩
ততোজয়মুদীরয়েৎ	অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত	৯০৪

আর মনোকথা (কবিতা) শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ ৩২
তিলেক যদি টান হত (কবিতা) দরবেশ ২৩৫
তুমি (কবিতা) শ্রীমতী চারুবালা দত্তগুপ্তা ১১৩৮
তুমি যদি রও কাছে (কবিতা) শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বি, এল, ১০২৪
তোমার হাসি (কবিতা) ঐ ৫৮
তৃতীয় দৃষ্টি (কবিতা) শ্রীমতী লীলা দেবী ৯১৫
ত্যাগ ও ভোগ শ্রীউপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৪

দ

দহল মালা (কবিতা) কাজী নজরুল ইস্‌লাম ৬৬২
দাম্পত্য বন্ধনের কথা শ্রীনলিনী কান্ত গুপ্ত ৭৬৯
দীপ লক্ষ্মীর আবাহন (কবিতা) শ্রীমতী রাণা নিরুপমা দেবী ৭১২
দুই প্রণয়ী (কবিতা) শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা ৩৫৮
দুখিনীর ধন (কবিতা) শ্রীমতী সরলাবালা দাসী ২২৫
দুর্গোৎসব (কবিতা) শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী ১১৮৭
দুঃখ সাধন (কবিতা) শ্রীমতী রাণী নিরুপমা দেবী ৫৮৩
দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর ২৯৭
দেশের কথা শ্রীনীরদ রঞ্জন মজুমদার ৭০৯
দ্বিদল কমল শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্ট ৪৫০

ধ

ধর্ম্ম ও জীবন শ্রীউপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬৩
ধর্ম্মের বনিয়াদ শ্রীমতী সত্যবালা দেবী ৬৯৫, ৮৮৬

ন

নন্ কো অপারেশন (গল্প) শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী ৫৬৯
নর-নারায়ণ শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ ১০২৫
নারায়ণের নব বর্ষ ঐ ২
নারায়ণের নিকষমণি ৯৬, ২২১, ৩২৩, ৪১৭, ৫২৯, ৬৫৯, ৮৩৩, ৯৫৮, ১০৫৪, ১১৪৯,১২৩৬

নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ :—

উর্দ্দু ও বাঙ্গালা সাহিত্য ৯৫৬
গত কংগ্রেস ৯০
চাই স্বারাজ্য ৮৫৫
ছুঁৎমার্গ ২১৬

দধিচী ৬৫৯
ধর্ম্ম ও রাজনীতি ৩১৭
নিগ্রোসমস্যা ৫২৭
বাঙ্গালীর পেট্রিয়টিজম্ ৪২৪
বাঁধন হারা ৯৪
যন্ত্রপাতি ও তর্কবুদ্ধি ১০৩৫
রূপান্তর ১০৫০
সহজিয়া ২০৭,৪৩৫,৫৫২,৬৪৯,৭৫৫,৮৪৭,৯৫২,১০৩৮,১১৩৩,১২৩২
সংঘ কি ? ৪৩১
স্বরাজ ও স্বারাজ্য ৬৪০
স্বরাজ কাহার রাজ ও কোন্ রাজ ১০৪৩
সাধকের প্রশ্ন ৩১৯

নারায়ণের ৭ম বর্ষের বর্ণানুক্রমিক বিষয় সূচী ১২৪৯

নারী মঙ্গল শ্রীউষানাথ সেনগুপ্ত ৭৭৬
নারীর উক্তি শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৪০২
নারীর সমান অধিকার শ্রীমতী সত্যবালা দেবী ১৩৪
নিকুঞ্জে (কবিতা) শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম্ এ ৫০৭
নিরুদ্দেশের যাত্রী (ব.উল) কাজী নজরুল ইসলাম ৪৭৮
নির্ব্বাসিতের আত্মকথা শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩, ১৩৯, ২৫৭, ৩৪১, ৫০৫, ৫৮০, ৭১৩, ৮০৯, ৯৩৮, ১০১৮, ১১০৪
নিশ্চিন্ত (কবিতা) শ্রীবিজয় সেনগুপ্ত ৯০৬
নীরবে (কবিতা) শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী ২৮০

প

পণ্ডিচারীর পত্র শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ ৮৬২
পতিতার সিদ্ধি শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ৬২৩, ৭৩৩,৮১৬, ৯১৩, ৯৯২, ১১৪১
পথ (কবিতা) শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী ১৯২
পথের গান (কবিতা) শ্রীনিরুপমা দেবী ৩৬৮
পল্লী সত্য কি জনপদ সত্য শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ ৪৬১, ৬৫৭
পূজা (গান) শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ৪
পূর্ণতা (কবিতা) শ্রীমতী লীলা দেবী ১১০৪
পেটের দায় (কবিতা) শ্রীকালিদাস রায় ৪৫৪

প্রতিকার প্রার্থনা	শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী	৩৬৯
প্রতিবাদ	শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত	১৪৭
প্রভাতে (কবিতা)	শ্রীসরোজকুমার সেন	১৭৩
প্রভাতে (কবিতা)	শ্রীমতী বিজনবালা দেবী	৩৭৭
প্রভাস মিলনে (কবিতা)	শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী	৩৬৯
প্রলয়রূপ (কবিতা)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র	৭৩২
প্রিয় (কবিতা)	শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু	৮৮০

ফ

ফাল্গুনী ও বর্ত্তমান সমস্যা	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়	৪৯৯

ব

বঙ্গভূমি (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	৩৩৭
বঁধু দরশনে (কবিতা)	শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী	৪৬৪
বঁধুয়া (কবিতা)	শ্রীসুশীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৬৫
বদন ভঙ্গি (কবিতা)	দরবেশ	৬০৬
বর্ত্তমান সমস্যা	শ্রীনলিনী কান্ত গুপ্ত	৪৪২, ৪৭৯, ১১৫৩
বর্ষার গান (কবিতা)	শ্রীনগিগোপাল ঘোষ	৯৯০
বাঙ্গলার সাধনা	শ্রীউষানাথ সেনগুপ্ত	৩৩৮
বাঙ্গলা কাব্যে একটি নূতন সুর	শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	৮৬৭
বাঁধন হারা (কবিতা)	শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়	১০৮৪
বাঁশরী (কবিতা)	শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৫৭৩
বাঁশী (কবিতা)	শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী	১৮৪
বেদনার দান	শ্রীবিভুতি ভূষণ ভট্ট	৬৭৫
বিচারক (কবিতা)	শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী	১২০১
বিদায় চাহনি (কবিতা)	শ্রীকণীন্দ্র নাথ রায় বি, এ	২৭৫
বিপরীত (কবিতা)	শ্রীমতী লীলা দেবী	১০৫৬
বিফল নিশাথে (কবিতা)	শ্রীমতী কালি দাসী দেবী	৬৩৮
বিনিময় (কবিতা)	শ্রীমতী হেমলতা দেবী	৬৯৯
বিরহে (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ	৫২৮
বিলাপ বিধুরা (কবিতা)	শ্রীগোবিন্দ লাল মৈত্রেয়	১৬২
বিশ্ববিদ্যালয় গীতি (কবিতা)	শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়	৮৯২
বিশ্ব সন্ন্যাসী (কবিতা)	শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	৬৯৩
বিশ্বের দরবারে ভারত	শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	৫০

বুদ্বুদ	শ্রীসত্যবালা দেবী	৫৫১
বৈদিক ভাষায় স্বর-প্রকৃতি	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম,এ	৩৫৮
বোঝা (কবিতা)	শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী	১
ব্যথিতা (কবিতা)	শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্রেয়	৫৬৮
ব্রাহ্মণ (কবিতা)	শ্রীসতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪৫

ভ

ভাব সমর	শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার	৩২৯

ম

মনস্তত্ত্বের দিক	শ্রীমতী সত্যবালা দেবী	১১১০
মনোহর (কবিতা)	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	৮৩১
মনোহারী সভ্যতা	শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার	৭৮
মহানৃত্য (কবিতা)	শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়	১২২৯
মর্ম্ম ও বেদনা (কবিতা)	প্রসাদ	৮৯
মাঝখানে (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক	১০২৮
মায়াবাদ ও অদ্বৈততত্ত্ব	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	১১৮৮
মায়ের পরিচয় (কবিতা)	শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী	৫৯৯
মিছে (কবিতা)	শ্রীকালীপদ ঘোষ	৯৯০
মিলন (গান)	শ্রীনলিনীকান্ত সরকার	১১৩
মুক্তিগাথা (কবিতা)	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১১৭৫
মুক্তির গাথা (কবিতা)	শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়	৪১৫
মোড় ফিরাও (গান)	শ্রীনলিনীকান্ত সরকার	২২

য

যমুনায় (কবিতা)	শ্রীগিরিশচন্দ্র আচার্য্য কাব্যবিনোদ	৩৯৩
যাত্রী (কবিতা)	সাহাদৎ হোসেন	৪৯৭
যোগ বিয়োগ	শ্রীরাজকিশোর রায়	৭৮১

র

রাজা সন্ন্যাসী (কবিতা)	শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	১১১৮
রুধির রঙে ফোটা (কবিতা)	শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী	১০০৯

ল

লীলা (কবিতা)	শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু	১১৬০

শ

শমন দূত (কবিতা)	দরবেশ	৬৭৪

শরৎ সাহিত্যে মাতৃভাব	শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	১৯, ২৬৭
শাঙ্কর দর্শন কি স্ব-বিরোধী ?	শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর	৯৮১
শাস্ত্র বিচার (কবিতা)	দরবেশ	৮৪৭
শিক্ষায় 'উটজ' আদর্শ	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার	৫২১
শিবস্তুতি (কবিতা)	শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়	৬২১
শিল্প	শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩
শিল্প ও স্বদেশী	শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার	১২৪২
শিক্ষায় নবীন সৃষ্টি	শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ	৩৯৪, ৫৩৪, ৬৬২
শিশুর ভিক্ষা (কবিতা)	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৩৪৮
শ্রাবণে (কবিতা)	শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী	৮৬৫
	স	
সত্ত-সার	শ্রীমতী বনলতা দেবী ও বীণাপাণি দেবী	৬৭০
সত্য ও সৌন্দর্য্যবোধ	অধ্যাপক শ্রীরামপদ মজুমদার	৯৬১, ১০৫৮
সমাজ সংস্কারের ভূমিকা	শ্রীঅশ্রুমান দাশগুপ্ত	১১৬১
সমাজের কথা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১২৫, ২৮৭, ৬১৬
সহজ দান (কবিতা)	শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়	১৩৮
সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয়		১০১, ২২৩, ৩৩৪
সাহিত্যে অনুভূতি	অধ্যাপক শ্রী রামপদ মজুমদার	৫৯, ১৬৩
সাত্ত্বিক দুর্গোৎসব	শ্রীনলিনীকান্ত সরকার	৭২১
সিদ্ধি (কবিতা)	শ্রীমতী লীলা দেবী	১১২
সিনফিনের জন্মকথা	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৭
সিনফিনের পরিণতি	ঐ	৩৭৯
সুখের ঘর গড়া (উপন্যাস)	শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত	২৩, ১৭৩, ২৩৭, ৩৫০ ৪৮৮ ৭৪৯, ৭৮৯, ১৮৭৫, ১০২৯, ১০৬৯, ১২০৩
সুর ও স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৫৩৮, ৫৮৪
সৌন্দর্য্য সাধনা	শ্রীবিনয়চন্দ্র সেন বি, এ,	১৩
স্বরলিপি	শ্রীনলিনীকান্ত সরকার	৩৩৫
স্বরাজ (কবিতা)	শ্রীমতীলীলা দেবী	১২২৪
স্মৃতি	শ্রীমতী বীণাপাণি ও বনলতা দেবী	২৬৭
	হ	
হাজিরা (কবিতা)	প্রসাদ	৭৪৮
হাত দু'খানি	শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট	৫
হারামণি (কবিতা)	কাজী নজরুল ইস্‌লাম	১২১৬

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা] [কার্ত্তিক, ১৩২৮ সাল।

বর্ত্তমান সমস্যা

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

জগৎটা যে বড়ই খাপছাড়া—out of joints—হইয়া পড়িয়াছে, সে বিষয়ে আজকাল বোধ হয় আর দুই মত নাই। কোথাকার কি যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, খিল ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে, সব গোলমাল এলোমেলো অবস্থায়। মানুষের জীবন কোন দিনই একেবারে নির্দ্দোষ ছিল কি না সন্দেহ, অনেক খানেই হয়ত জোড়াতালি চাপাচুপি রফারফি ছিল; তবুও মোটের উপর একটা বেশ দৃঢ় বাঁধন নিবিড় শৃঙ্খলা পাওয়া যাইত। কিন্তু এমন স্পষ্ট বেসুরা বেতালা অবস্থায় মানুষ বোধ হয় এই প্রথম পড়িয়াছে। সুখ সে হয়ত কোন দিনই পায় নাই, আজ কিন্তু সে স্বস্তিকে পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব নিকাশ করিয়া দেখিয়াছেন যে বর্ত্তমান যুগে অ-ধাতস্থ লোকের (unstable mind বা neurotics) সাদা কথায়, পাগলের—ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এমন কোন দিনই ছিল না। শেষ পগলামীর যুগ গিয়াছে, ইউরোপে ফরাশী বিপ্লবের যুগ। কিন্তু তখন বায়ুদেবতার কৃপা হইয়াছিল বিশেষভাবে ফরাশী দেশের উপর—আজ কাল সমস্ত জগৎ ভরিয়া তাহার ওলট-পালট চলিতেছে।

বলা যাইতে পারে, নূতন সৃষ্টির নূতন শৃঙ্খলার এই হইতেছে পূর্ব্বাভাস। কিন্তু তাই মনে করিয়া ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। গাছ বা পাথর বা পশু নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। মানুষের ধর্ম্ম হইতেছে সজ্ঞানে সৃষ্টির কাজে সহায়তা করা—

এইটি সে যতখানি করিতে পারিবে ততখানিই তাহার সার্থকতা সুতরাং আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, এই সঙ্কটাবস্থায় কি করা মানুষের উচিত, কি না করিলে হয়ত নূতন সৃষ্টির নূতন শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তে জগতে ঘটিবে শুধু প্রলয় আত্যন্তিক বিনাশ।

জগতের কলটা বিগড়াইয়া গিয়াছে—এটাকে সারিতে হইবে। অনেকে তাই নজর দিয়াছেন, নেহাৎই কলকব্জার দিকে, বাঁধন গুলি আটিয়া দাও, পেরেকগুলি কসিয়া দাও, ভাঙ্গা মরিচা ধরা পুরান যন্ত্রপাতির পরিবর্ত্তে নূতন যন্ত্রপাতি বসাও। অর্থাৎ আইন কানুন করিয়া বিধি নিষেধ দিয়া বাহিরের কর্ম্ম প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার কর, নূতন ব্যবস্থা মানুষের হাতে তুলিয়া দাও। সুশৃঙ্খলার, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সভা সমিতি কর, কর্ত্তব্যের নিয়মাবলী বাঁধিয়া দাও, কার্য্যের ভাগ বাটরা কর, দায় ও দাবির যথাযথ পরিমাণটা মাপিয়া জুখিয়া ঠিক করিয়া ফেল। তাই সমাজের মানুষ-জীবনের কত রকম ছক আকিয়া system তৈয়ার করিয়া যে সম্মুখে ধরা হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্ চৌদ্দটি সূত্রে জগতের দিব্যযুগের চমৎকার একটি প্লান করিয়া দিলেন। বোলশেভিকেরা তাহাদের ব্যবস্থাপকদের নির্দ্দেশ অনুসারে ভয়ানক জোরে মানুষকে নূতন একটা যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া ঢালাই করিতে ব্যস্ত হইয়াছে। আমাদের দেশেও বলা হইতেছে, একটা গবর্ণমেণ্ট বা শাসন যন্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেই ভারতবর্ষের সকল গোলমাল সকল সমস্যা চুকিয়া যাইবে।

কিন্তু এ কথাটা বুঝা কি এতই কঠিন, সব নিয়মাবলীই যে চোথা কাগজের টুকরা a scrap of paper? আইনকানুনের এমন কোন স্বতঃসিদ্ধ শক্তি নাই, যাহার বলে সে আপনা আপনিই কার্য্যে পরিণত হইয়া যাইবে; জোর জবরদস্তি করিলেও ব্যবস্থা অনুসারে যে অবস্থা হইবে, হইলেও যে টিকিয়া থাকিবে এমন নিশ্চয়তা কিছুমাত্র নাই। লেফাফা মাফিক যতই থাকুক না কেন, মানুষের কাজ হইবে তাহার ভিতরটা যেমন সেই অনুসারে। ভিতরের প্রয়োজন অনুসারে মানুষ যন্ত্র গড়িয়া লইবে, বাহির হইতে দেওয়া কোন যন্ত্র সে ব্যবহার করিতে চাহিবে না, চাহিলেও পারিবে না। ভিতরটা যাহার দস্যু ভাবাপন্ন, সে-মানুষের হাতে সাধুর দণ্ডকমণ্ডলু তুলিয়া দিলে কি হইবে? কমণ্ডলুতে সে বিষ গুলিবে, দণ্ড দিয়া মাথা ফাটাইবে।

জগৎটা, মানুষের জীবনটা দুঃস্থ পীড়িত। সুতরাং প্রতিকার চাই জগতের

কর্ম্ম প্রতিষ্ঠানে নয়, বাহিরের জীবনে নয়, প্রতিকার চাই মানুষের নিজের অন্তরে। মানুষকে ভিতরে ভিতরে শুদ্ধি ও স্বাস্থ্য পাইতে হইবে, তবেই বাহিরে শুদ্ধি ও স্বাস্থ্য দেখা দিবে। তাই অনেক মহাপুরুষ কবি শিল্পী বলিতেছেন, মনটাকে আগে বদলাও—মনো পূর্ব্বঙ্গমাধর্ম্মা—সকল ধর্ম্মের আগে আগে চলিয়াছে মন, মনের গড়ন যেমন ধর্ম্মেরও গড়ন তেমনি হইয়া উঠে। কর্ম্মের পরিবর্ত্তনের আগে চাই ভাবের পরিবর্ত্তন, ভাবের পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল হইতেছে কর্ম্মের পরিবর্ত্তন—মনের, ভাবের পরিবর্ত্তনের পরে কর্ম্মের পরিবর্ত্তন সহজ, পূর্ব্বে একেবারে অসাধ্য।

এখন, এই মনের বা ভাবের পরিবর্ত্তনের অর্থ কি? মানুষের ধারণা হইবে অন্য রকমের, তাহার চিন্তা চলিবে নূতন স্রোতে। মানুষ কেবল নিজের কথা ভাবিবে না, ভাবিবে দেশের দশের কথা; মানুষ কেবল স্বার্থ দেখিবে না, লাভ দেখিবে না, দেখিবে পরার্থ, দেখিবে কল্যাণ; মানুষ খুঁজিবে আদর্শ, উচ্চতর উদারতর সত্য। মানুষের চিন্তা জগতে পরিবর্ত্তন চাই, তাহার বুদ্ধি নির্ম্মল হইবে, সেখানে ফুটিয়া উঠিবে স্থূলজগতের পাশব প্রকৃতির ছায়া নয়, পরন্তু একটা সূক্ষ্মজগতের একটা দিব্য প্রকৃতির আলো। ঠিক কথা, কিন্তু ইহাকেই যথেষ্ট বিবেচনা করিলে বিষম ভুল হইবে। এই ভুল আমরা পদে পদে করিয়াছি ও করিতেছি—ইহার সংশোধন চাই।

আধুনিক যুগে জর্ম্মণী দেশে চিন্তাশক্তির যেমন পরিচয় পাইয়াছি, আদর্শের প্রাদুর্ভাব সেখানে যেমন হইয়াছে, এমন কোথাও আর হয় নাই। সারা ইউরোপ ত তাহার শিক্ষা দীক্ষায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল—কিন্তু এই ইউরোপই আবার যুদ্ধের সময় জর্ম্মণীর মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল। মনের পরিবর্ত্তনে চিত্তের পরিবর্ত্তন হয় না, চিত্তের উপর একটা ভাসা ভাসা জলুস দিয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু প্রয়োজনের চাপে তাহা উপিয়া যায়, স্বভাবের স্বরূপ তখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে। চিত্তের সংস্কারের বিরুদ্ধে মনের ভাব বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে না, বরং সাক্ষাতে না হউক লুকাইয়া মন চিত্তের ধারা অনুসারেই চলে, রকম ফের দিয়া চিত্তেরই খোরাক জুটাইতে থাকে। Intellectualist-এরা, ধর্ম্মপ্রচারকেরা এই কথাটায় তেমন আমল দেন নাই বলিয়াই তাঁহারা মানুষের প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ ফল লাভ করেন নাই।

বুদ্ধির বিকৃতি তত দোষের নয়, যত দোষের হইতেছে চিত্তের বিকৃতি। বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সাথে বিশেষ ভাবে

শুদ্ধ করিতে হইবে চিত্তকে। অর্থাৎ আদর্শকে, সত্যকে, মঙ্গলকে শুধু বুঝিলে চলিবে না, স্বীকার করিলে চলিবে না ; তাহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাহাতে অনুরক্ত হইতে হইবে—তাহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। প্রেমের রসে সত্যকে যতদিন অভিসিক্ত করা হয় নাই, আনন্দে যতদিন আদর্শ সজীব সবুজ হইয়া উঠে নাই, ততদিন সে সত্য সে আদর্শ সুন্দর হয় নাই, স্বভাবের মুখ ফিরাইতে পারে নাই, জীবন গতির মধ্যে নূতন টান বহাইতে পারে নাই। বুঝিয়াছি যাহা তাহাকে ভালবাসিতে হইবে ; মস্তিষ্কে যাহা নীরস, চিত্তে তাহাকে সরস করিয়া ধরিতে হইবে—নতুবা তাহা কার্য্যোপযোগী হইবে না, নতুবা পরিশেষে দেখিব—

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে!

এখানেও তবুও শেষ নয়। মনের ভাব প্রথমে দরকার, তারপর মনের ভাবকে চিত্তের ভাবুকতায় পরিণত করিতে হইবে, তবুও কিন্তু সত্য স্থির জাগ্রত নিরেট অটুট হইয়া দেখা দেয় না। আমাদিগকে আরও অগ্রসর হইতে হইবে—চিত্তের পরে প্রাণে অথবা ঠিক করিয়া বলিতে গেলে শরীর-ঘেঁষা প্রাণের স্তরে পৌঁছিতে হইবে। জগতে কত আন্দোলন—movement হইয়াছে, ধর্ম্মের আন্দোলন সমাজের আন্দোলন ; কিন্তু কিছুই ত তেমন স্থায়ী হয় নাই। মনের ভাব বা চিন্তামাত্র লইয়া নয়, চিত্তের (ও প্রাণের উপরের স্তরের) আবেগ লইয়াই ত কত মহান্ আদর্শ জগতে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে ; কোনটা একেবারে বিফল হয় নাই, প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নবজীবনের পলিমাটি ফেলিয়া গিয়াছে, সত্য কথা ; কিন্তু প্রয়াসের তুলনায় ফল, আশার তুলনায় লাভ, উচ্ছ্বাসের তুলনায় বস্তু কতটুকু পাওয়া গিয়াছে? লোক যে জগতের মানব জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্রদ্ধালু হইতে পারে না, আস্তিক হইতে পারে না, তাহার কারণই এইখানে।

বস্তুতঃ জগতে শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকে কোন শক্তি, পরিণামে কাহার জয় অবধারিত? প্রকৃতিং যান্তিভূতানি—এই প্রকৃতির অন্য নাম প্রাণের ধর্ম্ম। চিত্ত হইতেছে অসীম সজীব, সকল জিনিষের বীজ সেখানে, সকল জিনিষের রস সেখানে। কিন্তু জিনিষ যে বিশেষ রূপ পাইতেছে, যে নিয়মে গড়িয়া উঠিতেছে চলিতেছে, যে ভঙ্গীতে কার্য্যে ফলিত হইতেছে তাহা সব দিতেছে প্রাণের শক্তি। হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেতি ত এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবন্। চিত্ত রঙ্

দিতে পারে কিন্তু আকার দিতেছে প্রাণ। চিত্তের সংস্কারের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু এই সংস্কারের মূলে রহিয়াছে যে আদি মৌলিকশক্তি তাহা প্রাণের শক্তি। সত্যকে বুঝিবার সত্যকে ভালবাসিবার আগে সত্যকে পাওয়া চাই। কোথায় সত্য? মানুষের কাছে নিবিড়তম নিকটতম সত্যতম সত্য হইতেছে প্রাণের সত্য। প্রাণের প্রকৃতির যে প্রতিমা তাহার উপরই মানুষ অনুরক্ত, মানুষ তাহাকেই ভাল বুঝে, কার্য্যে অন্ততঃ তাহাকেই ফলাইয়া চলে।

প্রাণাদ্ধ্যেবোদেতি প্রাণেঽস্তমেতি তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্ম্মং
স এবাদ্য স উ শ্ব ইতি।

ইউরোপীয় চিন্তা জগতেও আজ কাল এই প্রাণের কথাটাই খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। তর্কবুদ্ধির বন্ধ্যাত্ব, ভাবালুতার পঙ্গুত্ব দেখিয়া সেখানকার দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন আসল সত্য হইতেছে Vital plane এর সত্য Physico-biological laws—সৃষ্টির মধ্যে বিবর্ত্তন, মানুষের মধ্যে রূপান্তর চলিতেছে এই প্রাণের ধর্ম্মকে ধরিয়া, ঘিরিয়া। এই ধর্ম্ম অটুট অব্যর্থ, ইহাকে কাটাইয়া চলিবার উপায় নাই। প্রথমতঃ, মানুষের স্বভাব গড়িয়া উঠিয়াছে ইহারই নিয়ম অনুসারে। মানুষের হৃদয়, মানুষের মন এই বস্তুটিরই ফুল লতা পাতা, এখানে যে সব প্রেরণা আছে তাহাদেরই সার্থকতার বহু বিচিত্র উপায় ; এই সত্যটির সহিত মনের হৃদয়ের যে কল্পনার যে অনুরাগের যত সঙ্গতি তাঁহারাই তত শক্তিমান, তত ফলপ্রসূ আর যে সব জিনিষ ইহার সম্পর্ক-বিরহিত বা ইহার পরিপন্থী তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারে না। মানুষের স্থূল শরীরটিও এই প্রাণেরই বাহন, প্রাণের ধর্ম্মের ফল বা পরিণতি, জাগ্রত মূর্ত্তি মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের প্রতিষ্ঠানাদিও গড়িয়া উঠিয়াছে সেই প্রাণেরই ধর্ম্ম অনুসারে মানুষের যে মৌলিক প্রকৃতি তাহাই চরিতার্থতার জন্য। সমাজ যে একটা বিশেষ রূপে বাঁধা পড়িয়াছে, মানুষ যে একটা বিশেষ ধরণে জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে একটা বিশেষ প্রণালীতে আদান প্রদান চলিতেছে—এ সমস্তই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে মানুষের, প্রকৃতির প্রাণ শক্তির প্রয়োজন বা দাবি অনুসারে।

সুতরাং পৃথিবীতে স্বর্গ বানাইব, সমাজকে নন্দনে আর মানুষকে নন্দনের পারিজাতে পরিণত করিব অথবা এই রকম আরও যে কত কত utopia বা স্বপ্নের রাজ্য মানুষের মনে ও চিত্তে খেলিয়া উঠিতেছে তাহা সত্য হইতে পারে,

বাস্তব হইতে পারে একমাত্র তখনই যখন মানুষের প্রাণে তদনুযায়ী রূপান্তর ঘটিয়াছে বা ঘটাইতে পারিয়াছি। কিন্তু ইহা কি কখন সম্ভব?

সমস্যার ব্যাসকূট প্রাণের রূপান্তর। কারণ, সকল রূপান্তরের, বিশেষতঃ স্থূল বাস্তব ভৌতিক রূপান্তরের কেন্দ্র হইতেছে এই প্রাণশক্তি। প্রাণে একরকম গ্রন্থী পড়িয়াছে, তাই জগতের সমাজের মানুষের চেহারা এই রকম হইয়াছে; চেহারা আর একরকম করিতে হইলে এই গ্রন্থী খুলিয়া আর রকম গ্রন্থী দিতে হইবে। কিন্তু প্রাণের ত যথা ইচ্ছা রূপ দেওয়া যাইতে পারে না, যেমনটি ভাল লাগে যেমনটি পছন্দ হয় তেমন করিয়া প্রাণকে ঢালাই করিতে পারি না—প্রাণ যে চলিয়াছে নিজের তোড়ে নিজের:জোরে; দু দিন হয়ত তাহাকে এখানে ওখানে বাঁধা দিয়া রাখিতে পারি, খাল কাটিয়া এদিক ওদিক্ করিয়া দিতে পারি, কিন্তু ভরা বর্ষার কীর্ত্তিনাশার মত সে একদিন নিজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া আপন পথ করিয়া লইয়া চলিবে, তাহার ত কোন সন্দেহই নাই।

তাই ত অনেক মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন, অনেক ধর্ম্মও শিক্ষা দিয়াছে, জগতের সমস্ত মানুষের বা সমাজের পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়, ইহজগতের নিয়ম অনুসারেই ইহজগৎ চিরকাল চলিবে। মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হইতে পারে ব্যক্তিগত মুক্তি অর্থাৎ নিয়ম বদলানের চেষ্টা নয়, নিয়মের অতীত হইয়া চলিয়া যাওয়া। বহুর, রূপের, সম্বন্ধের খেলা যেখানে সেখানেই হইয়াছে প্রাণের, মায়ার, অবিদ্যার প্রতিষ্ঠা—এ সকলের শেষ ঐকান্তিক নিবৃত্তি যেখানে সেই শান্ত এক অদ্বৈত সত্তায় নির্ব্বাণ লাভ করাই মানুষের বিদ্যা-সিদ্ধি, পরম পুরুষার্থ। জগৎকে স্বর্গ বানান যায় না, যদি চাও স্বর্গে উঠিয়া যাইতে পার।

ইহাই যদি সত্য হয়, তবে অবশ্য কোন উপায় নাই। কিন্তু আশার কথাও আছে। মানুষের মনে চিত্তে যে সব সোণার স্বপ্ন ফলিয়া উঠে, যুগে যুগে উঠিতেছে ও মানুষ বার বার বিফল হইয়াও চেষ্টা করিতেছে তাহাকে বাস্তব করিয়া তুলিতে—প্রাণের মধ্যে যদি ইহার কোনই শিকড় না থাকিবে, তবে তাহা আদৌ গজাইয়া উঠে কেন? মানুষের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রেরণা ঐ অসম্ভবের জন্যই ক্রমাগত চলিতে চাহিতেছে কেন? শুধু তাই নয়, এমন মহাপুরুষও অনেক আছেন যাঁহাদের কণ্ঠে শুনিতে পাই সত্যের অটুট বারতা—

বেদাহমেতৎ পুরুষং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

যাঁহারা আপন সত্যদৃষ্টি সত্যসৃষ্টির উপর ভর করিয়া, নির্ভয়ে বলিতে

পরিয়াছেন যে প্রাণের তামসরূপের পশ্চাতে আছে একটা দিব্যরূপ, এই তামসরূপকে সরাইয়া বাস্তব জীবনে সেই দিব্যরূপকে ফলাইয়া ধরা যায়; প্রাণের-রূপান্তর দুঃসাধ্য ক্ষুরস্য ধারাইব নিশিতা দুরত্যয়া—হইলেও, একান্ত অসাধ্য নয়।

প্রাণের রূপান্তর অসম্ভব বোধ হইয়াছে এই জন্য যে প্রাণকে ঢালাই করিতে চেষ্টা করিয়াছি মনের ও চিত্ত বেগের ধারায়, বুদ্ধির ও নীতির নিয়ম প্রাণের উপর চাপাইতে চাহিয়াছি। কিন্তু আধারের, অন্তঃকরণের, এ পারের সকল স্তরের কেন্দ্র হইতেছে প্রাণশক্তি; এ পারের কোন শক্তিই প্রাণশক্তির উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে, নৈতিক বৃত্তিকে, ভাবুকতার বৃত্তিকে সমস্তই প্রাণময় পুরুষের ঈশ্বরত্ব আজ না হউক কাল স্বীকার করিতে হইবে—আজও স্বীকার করিতেছে তবে গৌণভাবে, ভিন্ন রকমে। প্রাণময় পুরুষের প্রভু কে, ঈশ্বর কে? কাহার নিকট এই অসুর আত্ম বলিদান করিতে পারে? এমন কোন ধর্ম্ম আছে কি না, যাহার নিকট প্রাণের ধর্ম্ম হার মানে—এজন্য নয় যে সেখানে প্রাণ বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না, কিন্তু এই জন্য যে প্রাণ সেখানে পায় গভীরতর প্রাণ, প্রাণের ধর্ম্ম সেখানে আরও একটা উদারতর ধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়া যায়?

এক দিকে নিশ্চল ভেদাভেদ রহিত সত্তা—একংসৎ—অক্ষর ব্রহ্ম, ও আর এক দিকে এই চঞ্চল ভেদাত্মক প্রাণময় জগৎ। এই উভয়ের মাঝখানে আছে একটা সত্যের শুধু সত্যের বা সৎএর প্রতিষ্ঠান নয়, সত্যের ও ঋতের অর্থাৎ সত্যধর্ম্মের, চিন্ময় শক্তির বৃহৎ লোক—ইহার নাম উপনিষদে দেওয়া হইয়াছে বিজ্ঞানময় লোক; এখানেই আছে ধর্ম্মের স্বরূপ, কর্ম্মের প্রকৃত বিধান, প্রকৃতির বিশুদ্ধ মূর্ত্তি। প্রাণময়পুরুষ মনোময় ও অন্নময় পুরুষকে লইয়া এই বিজ্ঞানময় পুরুষেরই একটা বিকৃত স্বভাব ফলাইতেছে; প্রাণময় পুরুষ নিজের ধর্ম্ম অনুসারে চলিতেছে, অজ্ঞানের বশে আপন অন্তর্য্যামী বিজ্ঞানময় পুরুষকে অগ্রাহ্য করিয়া অস্বীকার করিয়াই যেন চলিতেছে, কিন্তু তবুও প্রভুর শক্তি সে অহরহ অনুভব করিতেছে। উপরের, ওপারের এই যে সত্য ধর্ম্ম তাহা প্রাণে পূর্ণ প্রকটিত হইতে পারে, প্রাণ যদি শান্ত হইয়া তাহাকে আসিতে পথ দেয়, তাহার ভঙ্গী অনুসারে চলিবার প্রণতি তাহার থাকে। এই অধ্যাত্ম-পুরুষের চিন্ময় তপোময় ধর্ম্মই একমাত্র প্রাণের ধর্ম্মকে পরিবর্ত্তিত রূপান্তরিত করিতে পারে, মানুষের মনকে চিত্তকে দেহকে একটা নূতন কাঠাম দিতে পারে, স্বভাবের ভাব পরিবর্ত্তন

করিয়া সমাজের মূর্ত্তিও অন্য রকম করিয়া দিতে পারে। সমাজের স্থায়ী পরিবর্ত্তন, এই এক রূপান্তর ছাড়া আর কোন পথে সম্ভব নহে। প্রাণকে আর কোন শক্তি দিয়া গড়িতে বা চালাইতে পারা যায় না।

আজ যে মনুষ্য সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, মানুষের প্রাণে—মনে, চিত্তে দেহে একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে চাই ঐ উপরের লোক হইতে অধ্যাত্ম-ধর্ম্মের অবতরণের চাপ। মানুষের সমস্যা আজ তাই ইহাকে অভ্যর্থনা করিবার, ধারণ করিবার সাধনা।

লীলা

[শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু, বি-এ]

বসে আছি আপন মনে
স্তব্ধ বিজন হৃদয়-তীরে
তোমারি তরঙ্গ এসে
সেথায় পরশ করে ধীরে!
তরী তোমার দুলে দুলে
নেচে বেড়ায় কূলে কূলে;
গানটি তোমার উঠে জাগি
আমারি বুক চিরে চিরে!

উদয়-রবির প্রথম কিরণ
আজি আমার পড়লো মাথে
উঠলো হেসে বসুন্ধরা
ওগো, তারি সাথে সাথে!
এম্‌নি প্রেমে এম্‌নি গানে
বন্ধু, তোমার আলোর বানে
উজল কোরে তুলো আমার
বিদায়-দিনের সন্ধ্যাটিরে!

সমাজসংস্কারের ভূমিকা

(শ্রীঅশ্রুমান দাশগুপ্ত)

আজকাল আমরা সকলেই বুঝিতে পেরেছি যে আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ক্রমশঃই জটিল হ'তে জটিলতর হয়ে চলেছে। কিন্তু এই জটিল সমাজের গ্রন্থিগুলি মোচন করে সমাজকে শ্রেয়ঃ ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে হ'লে যতটা চেষ্টা করা ও যত্ন লওয়া দরকার ততটা আমরা করছি কিনা বিশেষ সন্দেহ। সমাজের উপর আমাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হ'লে যে সমস্যা গুলি আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত সেগুলিকে সত্যের আলোতে পরীক্ষা করে যথাযথ সমাধান করতে হবে। নচেৎ সমাজের অশেষ অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী যে সমাজসৌধ এতদিনের সাধনার ফলে গড়ে তোলা হয়েছে তার পতন একেবারে অনিবার্য্য।

গত আষাঢ় মাসের ভারতবর্ষে "চয়ন" বিভাগে উদ্ধৃত শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্ বি মহাশয়ের "স্বাস্থ্যের অবস্থা ও ব্যবস্থা" নামে প্রবন্ধটী পড়লেই উপলব্ধি হবে যে আজ কোন্ সমস্যাটা আমাদের প্রবল হয়ে পড়েছে। বাংলার ২৩টী জেলার অধিবাসীর জন্মমৃত্যুহারের যে তালিকা সেখানে প্রকাশিত হয়েছে তা দেখলেই বোঝা যাবে বাঙ্গালীকে যে "Dying race" বলা হয় সে একটুও অত্যুক্তি নয়। মৃত্যুর হার জন্মের হারের চাইতে এ ভাবে বেড়ে চললে, কিম্বা বর্ত্তমান অবস্থাটার "ভাল'র দিকে পরিবর্ত্তন না ঘটলে বাংলা শীঘ্রই শ্মশানে পরিণত হবে। কি উপায়ে এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে ধ্বংসের করাল গ্রাস হ'তে রক্ষা করা যায় এইটাই আজ আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে এপ্রকারেরই একটা অবস্থা সমস্ত জাতীয় জীবনে এসে পড়েছিল, আর আমাদের বর্ত্তমান সমস্যাটীর মত একটা সমস্যা বিপুল আন্দোলন ও প্রভূত গবেষণার সৃষ্টি করেছিল। কি উপায়ে একটা জাতি এই বিশ্বব্যাপী জীবনযুদ্ধে আত্মরক্ষা করে উন্নতির পথে ধাবমান হতে পারে—এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে তখনকার বড় বড় দার্শনিক ও সাহিত্যিকগণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ আলোচনার ফলেই দেশে একটা নূতন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছিল ইংরাজীতে একে Eugenics বলা হয়। ইংলণ্ডে Sir Francis Galton এই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা।

বর্ত্তমান যুগে জীবনযুদ্ধটা অত্যন্ত সঙ্কটময় ও ভীষণ হয়ে পড়েছে। ব্যক্তির পক্ষে কিম্বা জাতির পক্ষে আত্মরক্ষা করে অগ্রসর হওয়া কতটা কষ্টসাধ্য ও শ্রমসাপেক্ষ সে অনুভব করতে কিম্বা এবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করতে আমরা কেহই বাদ পড়ি নাই। এ বিশাল জগৎজোড়া প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে জাতির কোন্ সম্পত্তিটা সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী হবে এ প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে জেগে উঠে। এর উত্তর পণ্ডিত Ruskin এর ভাষায় পাই "There is no wealth but life" জনবলই জাতির একমাত্র সম্পত্তি। তবেই বর্ত্তমান যুগে একটা জাতির জয়ী হতে হলে তার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক আর সব চাইতে বেশী কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিরূপ সম্পত্তি একটা স্থায়ী রকমের "ব্যাঙ্ক" থাকা চাইই। কি উপায় অবলম্বন করলে পর একটা জাতিতে অধিক সংখ্যক কার্য্যদক্ষ শক্তিসম্পন্ন প্রতিভাবান্ সন্তানের উৎপত্তি ও রক্ষা হতে পারে সেই উপায় নির্দ্ধারণ ও তত্ত্বান্বেষণ Eugenist দের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালী জাতির—বর্ত্তমান অবস্থায় এই "সুপ্রজনন" বিজ্ঞানের আলোচনা হওয়া খুবই দরকার—কেন না আমাদের যে জন সম্পত্তির "ব্যাঙ্ক" ছিল সেখান থেকে ক্রমাগত ব্যয়ের উৎসবই চলছে, জমার ঘরে একটা কাণা কড়িও পড়ে নাই। মিথ্যা লজ্জার থেকে এড়াতে না পেরে এই কল্যাণকর নববিজ্ঞানটীর আলোচনার আবশ্যকতা বোধ হয় আমরা উপলব্ধি করতে পারব না। এই প্রাণঘাতিনী লজ্জা আমাদের ছাড়্তেই হবে—কারণ বেঁচে থাকা ত আমাদের চাইই এইটীই আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য এমন কি নীতির দিক হতেও।

তারপর এই বিশিষ্ট কারণের সঙ্গে আরও কতকগুলি ছোট খাট রকমের কারণ জড়িত আছে যার জন্য এবিষয়ের আলোচনা খুব আবশ্যক বলে মনে হয়। গত ইউরোপের মহাযুদ্ধের ফলে আমাদের দেশে ভীষণ "অর্থসঙ্কট" ও "অন্নসমস্যা" এসে পড়েছে। এই সমস্যার সমাধান আমরা নানাজনে নানাভাবে করছি। জাতীয় শিল্প বিস্তার, চাকরীর মোহ ত্যাগ করে ব্যবসা বাণিজ্য অবলম্বন প্রভৃতি উপায়ে এই অন্নকষ্ট ও অর্থাভাব দূর হইতে পারে মহাত্মা প্রফুল্লচন্দ্র এ কথা আমাদের বরাবর বলে আস্ছেন। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের দেশের যুবক সমাজ "মহাত্মা রায়"এর প্রদর্শিত সু-পথটী নানাবাধাবিঘ্ন সঙ্কুল ও আয়াসসাধ্য মনে করে গ্রহণ করতে পারছেন না। বিভিন্ন উপায়ে এই প্রশ্নের সমাধানে আজ তারা প্রবৃত্ত হয়েছেন। বর্ত্তমান আর্থিক অনাটনকালে "বিবাহ না করা" কিম্বা কোন উপায়ে বংশ

বিস্তারের পথ অবরুদ্ধ করা প্রভৃতি বিষয় তাদের মধ্যে একটা মস্ত আলোচনার ব্যাপার হয়ে পড়েছে। এগুলি আমার মনগড়া কথা নয় একটু চেষ্টা করলেই এর সত্যতার প্রমাণ সকলেই পেতে পারেন। এ সম্বন্ধে আমি আর অধিক কিছু বলব না যতটুকু বলেছি ততটুকু বলবার তাৎপর্য্য এই যে, আজ যে বিষয়টার অবতারণা আমি করতে যাচ্ছি তাকে কেহ যেন অনাবশ্যক বলে উড়িয়ে না দেন।

আমার এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় বল্তে বিবাহ-সংস্কার। সুপ্রজনন বিদ্যা সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে এখান থেকেই আরম্ভ করতে হবে। বিবাহ বন্ধনের মধ্যেই নারী ও পুরুষের যৌন সম্মিলনের ফলেই মুখ্যভাবে ব্যক্তির ও গৌণতঃ জাতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিবাহের উদ্দেশ্য কি এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের শাস্ত্রকার বলে গেছেন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।" পাশ্চাত্য দেশের সমাজতত্ত্ববিদগণ বলেছেন "The function of marriage is to maintain the species"। সংসারে সন্তান উৎপাদনের দ্বারা সমাজস্থিতির জন্যই স্বামী-স্ত্রীরূপে পুরুষ ও নারীজাতির যৌন সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমাদের আর্ষ উক্তির সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতদের উক্তির বেশ সঙ্গতি আছে। একটা কথা এখানে মনে স্বভাবতঃই জেগে উঠে যে আমাদের বিবাহসংস্কারের মধ্যে এই কি সম্পূর্ণ সত্য? সত্যকে পূর্ণভাবে পেতে হলে আমাদের কর্ত্তব্য ও ভাবের সমস্ত দুয়ারগুলি খুলে তাকে ধ্যান করতে হবে, তা না হলে আমরা সত্যের সাক্ষাৎ লাভ পাব না, আর যদিই বা পাই তবে হয় সে আংশিক সত্য কিম্বা সত্যের বিকৃতমূর্ত্তি। মানুষের কর্ত্তব্য ধারা অনেক; তার মধ্যে বিশিষ্ট ও প্রধান দুইটী মানুষের নিজের প্রতি কর্ত্তব্য, যার উদ্দেশ্য আত্মচরিতার্থতা (Self-realisation) আর সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য—যার উদ্দেশ্য সমাজের কিম্বা মানবজাতির কল্যাণসাধন। কোন কার্য্যকে বিচার করতে হলে কিম্বা প্রকৃত কর্ত্তব্য অবধারণ করতে হলে ব্যক্তি ও সমাজ এই দুই দিক হতে তাকে দেখতে হবে। উপরের উদ্ধৃত দুইটী বচনকে বিচারের এই মাপদণ্ডে পরীক্ষা করলেই তাদের দোষগুণ ধরতে পারা যাবে। বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রজাসৃষ্টি, এ কথাটা-সমাজের কল্যাণের দিক হতে সত্য হলেও ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে আত্মচরিতার্থতার পক্ষে এ সংস্কারটার উপযোগিতা কত সে খবর আমাদের না দেওয়াতে অর্দ্ধেক সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরের দুইটী বাক্যই সমাজতত্ত্ববিদের বাক্য। সমাজতত্ত্ব বা জীবতত্ত্ব আমাদের জীবনের সকল

ব্যাপারকেই সমাজের পক্ষ হতে বা জীবদেহের দিক হতে বিচার করে, তাই তাদের প্রচারিত কথা একটা পূর্ণ সত্যের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে না কেবল Half truths হয়ে থাকে। সমাজতত্ত্ববিদ্ ভুলে যান যে, মানুষের পক্ষে সমাজের কল্যাণ-চিন্তার সঙ্গে আরও একটা চিন্তার বিষয় আছে যার কেন্দ্র "আমিতে" সংস্থিত। জীবতত্ত্ববিদ্‌ও ভুলে যান যে মানুষের দেহাতিরিক্ত একটা পদার্থ আছে যাকে বলে "মন"। অপর পক্ষে আর একদল লোক আছেন যাঁরা "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের" (Individualism) পক্ষপাতী। তাঁরা ব্যক্তিকে সমাজ থেকে ভিন্ন করে দেখতে চেষ্টা করেন—ব্যক্তির ইচ্ছা ও অনিচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও অনভিলাষ, ভালবাসা কিম্বা ঘৃণা, সুখ কিম্বা দুঃখ ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত সত্য মনে করেন এবং সমাজের কল্যাণ চিন্তা মনে স্থান দিয়ে ব্যক্তিত্বের গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করতে চান না। এদের প্রচারিত সত্যও Half-truth.

এখন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সম্বন্ধে কিছু বলব। ইউরোপে কিছু কাল পূর্ব্ব হ'তে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ চলেছে। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবল আত্মপ্রকাশ দেখতে পাওয়া গেছে দাম্পত্য বন্ধনের শিথিলতায়। এতদিন পর্য্যন্ত যে বিবাহ বন্ধন একটী নারী ও একটী পুরুষকে পরস্পর পরস্পরের সহচরভাবে একাগ্রতায় সমপ্রাণতায় সম্মিলিত করে কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিত সেই বিবাহ-সংস্কারই আজকাল তাদের মধ্যে কর্ত্তব্যের ও চিন্তার একমুখীনতার সৃষ্টি করতে পারছে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবল প্লাবনে জাতি ও সমাজের সঙ্গে—ব্যক্তির সম্বন্ধে মিলন-ক্ষেত্র আর চোখে পড়ছে না। বিবাহবন্ধনের দ্বারা নারী ও পুরুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হয় কি না, আর কি প্রকারে এই দাম্পত্য সম্বন্ধকে সমাজের মঙ্গলের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে আত্মচরিতার্থতা আদর্শের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, এর যাথার্থ অবধারণের জন্য পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্ম-মন্দিরে, রঙ্গমঞ্চে, মাসিক পত্রিকায়, উপন্যাসে আলোচনার প্রবাহ চলেছে। আমাদের দেশেও নারী জাতির ব্যক্তিত্ববোধের চিহ্ন আর নানাপ্রকার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তিত্বের নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একটা উদ্যম ও আয়োজন আমরা চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি। তবে কি না এই ভাবটা যতটা ব্যাপকরূপে ও শক্তির সঙ্গে ও-দেশে জেগে উঠেছে আমাদের দেশে ততটা হয় নাই। এখনও হয় নাই বলে যে কোনও দিন হবে না এমন ধারণা করাটা কিন্তু আমাদের ভুল হবে। এই যে ভারতবর্ষ এতদিন পর্য্যন্ত

চারিদিকে একটা সংস্কার ও আচারের প্রাকার তুলে ভাবের স্বাতন্ত্র্য ও কর্ম্মক্ষেত্রের বিশিষ্টতা রক্ষা করে এসেছিল সে প্রাকার ত অনেক দিন হ'ল ভাঙ্গতে আরম্ভ হয়েছে। এই কয়েক বছরের মধ্যেই পাশ্চাত্য চিন্তা ও কর্ম্মের ঢেউ আমাদের জীবনের আদর্শের মূলে এত জোরে এসে আপতিত হয়েছে যে, আমরা কেহ কেহ এক নবযুগের আগমন আশায় আবাহন-গীতি-মুখর হয়ে উঠেছি। আবার কেহ কেহ সনাতন সমাজের উপর দক্ষযজ্ঞের পুনরভিনয় দেখবার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠেছি। এই স্বাতন্ত্র্যের প্রথম আত্মপ্রকাশের উৎকট প্রাবল্যে ও উত্তেজনায় আমাদের দেশেও যে দাম্পত্য-বন্ধন শিথিল হ'তে পারে এ আশঙ্কা বোধ হয় অন্যায় ও অমূলক হবে না। এই আশঙ্কার জন্যই ব্যক্তির ব্যক্তি হিসাবে আত্মচরিতার্থতার আদর্শ ও সামাজিক জীব হিসাবে সমাজের কল্যাণ-চিন্তার আদর্শ এই দুই আদর্শের সমঞ্জসীভূত এক নূতন শাশ্বত আদর্শের উপর দাম্পত্য-বন্ধনের প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে আমরা প্রয়াসী হয়েছি।

পূর্ব্বেই বলেছি ইউরোপে এ যুগটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সাহিত্যের মূল সুরটী যে এই হবে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই। তাই আজকাল সমাজতত্ত্ববিদের সঙ্গে সাহিত্যিকের একটা বিবাদ উপস্থিত হয়েছে। এ বিবাদের মূলে উভয়েরই সত্যকে লাভ করবার পূর্ণ যাথার্থ দৃষ্টির অভাব; কেহই পূর্ণ সত্যটীর সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে পারেন নাই, সত্যের একদিককার রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন মাত্র। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সংঘাত-ফলে নারী ও পুরুষের সম্বন্ধের যে তত্ত্বগুলি পরিস্ফুট হয়েছে সে তত্ত্বগুলিই এখন দেখা যাক্।

আজকাল আমাদের দেশী সাহিত্য সমালোচনাক্ষেত্রে ইবসেনের নাম প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। এই নরওয়েদেশীয় বিখ্যাত নাট্যকার তার সুপ্রসিদ্ধ "A Doll's House" নামে নাটকে দাম্পত্যবন্ধনকে সাহিত্যের আলোচনার বিষয় করে তুলেছিলেন। তিনি প্রচার করলেন—"যে স্বামী স্ত্রীর কর্ম্মজীবনের পরিধি প্রসারিত করার আকাঙ্ক্ষা ও ভাবজীবনের স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন সহ্য করতে পারবেন না ও নানা প্রকারে তার আত্মপ্রকাশের চেষ্টা প্রতিহত করতে প্রয়াসী হবেন, সেই স্বামীকে পরিত্যাগ করবার অধিকার ন্যায়ত স্ত্রীর আছেই।"

ইবসেন স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যধিক সহানুভূতিবশতঃ এ কথা বললে পর

তার প্রত্যুত্তর এসেছিল পুরুষজাতির পক্ষ হতে, Scandinaviaর খ্যাতনামা Strindberg এর নাটক হতে "বিবাহবন্ধন পুরুষজাতির পক্ষে ক্ষতিকর। বিবাহের দ্বারা পুরুষের পুরুষোচিত গুণগুলির পূর্ণ বিকাশ সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। নারীজাতি তার সুখের জন্য পুরুষকে আপনার দাসে রূপান্তরিত করে আর পুরুষ নারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজের আশা ও আকাঙ্ক্ষা বলি দিয়ে আত্মসঙ্কোচ করতে বাধ্য হয়।"

সুপ্রসিদ্ধ বার্ণর্ড শ তাঁর Man and Superman নাটকে Strindbergএর মতেরই পোষকতা করেছেন। ইবসেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই সময়ের অনেক নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক বিবাহের সাফল্য ও বিফলতা মাপ করতে বসেছিলেন স্বামীস্ত্রীর মিলনজনিত সুখানুভূতির মানদণ্ডে।

Ibsen নারীর পক্ষেই বলুন আর Strindberg পুরুষের পক্ষেই বলুন তাদের শিক্ষার মূলে রয়েছে প্রচণ্ড স্বাতন্ত্র্যবোধ ও উৎকট স্বানুভূতি। সত্য দ্রষ্টার স্থির ও সৌম্যমূর্ত্তি তাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই না, যা পাই সে শুধু সুতীব্র উত্তেজনা বা বিদ্রোহের রূঢ় বল।

এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মত প্রচারে ইংলণ্ডসমাজে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কি ভীষণ বিদ্রোহবহ্নি জ্বলে উঠেছে যেমন ঘরে তেমনি বাইরে H. G. Wells এর Ann Veronica উপন্যাস খানায় তার একটা উজ্জ্বল চিত্র আমরা দেখতে পাই।

"সংসারে উন্নতি করবার নারীর একটী মাত্র পথ সে শুধু এই পুরুষ-জাতটাকে তুষ্ট করে। পুরুষরাও ভেবে বসে আছেন জগতে যে নারীর সৃষ্টি হয়েছে সে শুধু তাদের সুখের জন্য। মাতৃত্বই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল।"

উপন্যাস খানা সম্পূর্ণ নারী ও পুরুষের প্রবল দ্বন্দ্বের কথায় পরিপূর্ণ। নারীর বিদ্রোহ-ধ্বনিতে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ-বাক্যে মুখরিত। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সাহিত্য স্বাধীনতা-প্রয়াসী মানবের অন্তর্গুঢ় বেদনার অপার চিত্তবিক্ষোভের চিত্র, জ্ঞানের গভীর আলোকপাতে সে চিত্র, চিরকালের সম্পদ হয়ে উঠে নাই। জীবনের ধ্রুবসত্যের দিকে চোখ রেখে এঁরা চলেন নাই তাই জীবনের বৈষম্য-বিরোধগুলি নিয়েই এদের কারবার চালাতে হয়েছে। "ঋষি টলষ্টয়" এর সঙ্গে তুলনা করলেই একথাগুলি অনেকটা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ রুষজাতীয় জীবনের পক্ষে এক নূতন প্রভাত

এক নূতন চিন্তার জাগরণের অরুণিমায়, পুরাতন প্রথা ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উন্মত্ত চীৎকার-ধ্বনির মধ্যে জাতির নবজীবন লাভ ব্যক্ত হয়েছিল। Herzen, Ogaryof প্রভৃতি এই বিদ্রোহ উৎসবের পুরোহিত হয়ে অজ্ঞানতা ও সমাজের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করলেন। প্রথমেই পুরাতন আদর্শ ও ভাবকে তাঁরা ভ্রমাত্মক ও কুসংস্কারজাত বলে ঘোষণা করলেন। অন্যান্য সংস্কারগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহসংস্কার সম্বন্ধেও সন্দেহ এসে উপস্থিত হল। ফ্রান্সে George Sandএর প্রথম বয়সে লিখিত উপন্যাসগুলির মত নারীপুরুষের যৌন-সম্বন্ধ নিয়ে রুস সাহিত্যে অনেক উপন্যাস লেখা চলতে লাগল। বিপ্লববাদীরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, চারিদিকে এই যে পুঞ্জীয়মান অন্যায় ও অত্যাচার সমাজের প্রথার দোহাই দিয়ে সংঘটিত হচ্ছে, একে দূর করতে হলে আরও বেশী রকম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধের বিকাশ একান্ত আবশ্যক। এই ভাব থেকেই তখন দেশে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা পুরুষ ও নারীর কি সামাজিক কি রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারেই সমান অধিকার ও যৌন-সম্মিলনের কতকটা অবাধ গতি প্রচারিত হতে আরম্ভ হল। অন্যান্য সকল দেশের মত এই যৌন সম্বন্ধ নির্দ্ধারণের আবর্ত্তে পড়ে রুসের অনেক মঙ্গলময় প্রচেষ্টা বিফল হয়ে গিয়েছিল। যৌন ব্যাপারে যে স্বাধীনতা এই নব্যতন্ত্রীরা দাবী করছিলেন, সে স্বাধীনতাকে কোন্ পথে পরিচালিত করতে হবে, ব্যবহারিক জীবনে তাকে কি ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া যায় সে তাঁরা নির্ণয় করতে পারছিলেন না। Tolstoi তখন দর্শকভাবে ব্যাপারটা দেখছিলেন আর এই স্বাধীনতা যে ক্রমশঃই উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হবে এ তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন। মানব জাতির মঙ্গলকামী ঋষি প্রচার করলেন "যে দিন আমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রকৃতি পশুধর্ম্মটাকে দূর করে দিতে পারবে, সে দিনই আমাদের যথার্থ-স্বাধীনতা লাভ হবে। প্রত্যেক মানুষকেই ভাল করে বুঝ্‌তে হবে তার জীবনে কর্ম্ম ও চিন্তার পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করবার পথ কোথায়—দাম্পত্য জীবনে না কৌমার্য্য ব্রতে? বিবাহিত কি অবিবাহিত সকল জীবনেরই পরিণতি পূর্ণ পবিত্রতার আদর্শটাকে লাভ করা (The ideal of perfect purity)।

অনেকেই বলে থাকেন যে টলষ্টয় বিবাহ সংস্কারের বিরোধী ছিলেন আর তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করলে জাতি শীঘ্রই ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হবে। একথা সম্পূর্ণ ভুল। ১৮৮৫ খৃঃ What then we must do নামে তাঁর যে বইখানা

প্রকাশিত হয় তার শেষভাগে তিনি নারীজাতির নিকট এই আবেদন জানান যে তাঁরা যেন সন্তান প্রসব ও সন্তান পালনের কষ্ট সহ্য করতে ভীত না হন। ১৯০০ খৃঃ প্রকাশিত Kreutzer Sonata নামে উপন্যাস খানিতে তাঁর প্রভূত অভিজ্ঞতা ও সাধনার ফল পবিত্রতার সুমহান্ আদর্শ পবিত্র চিন্তা ও পবিত্র কর্ম্মের মধ্যে আত্মসমর্পণ লোক সমাজে উপস্থিত করেন। কৌমার্য্য ব্রতই সকল লোকের অবলম্বনীয় এমন কথা তিনি বলেন নাই, কৌমার্য্য জীবন যাপন জীবনের আদর্শ নয়, আদর্শ প্রাপ্তির একটা পথ মাত্র। প্রাপ্তিটাই সত্য, উপায় চিরকালই উপায়, সত্যকে ছেড়ে সত্যপ্রাপ্তির একটা উপায়কে যথার্থ বলে আঁকড়িয়ে ধরবার জন্যই মধ্যযুগে (madiwal period) রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম যাজকেরা এতটা অধঃপতিত হয়েছিল ; মঠের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের ব্যভিচারজাত সহস্র সহস্র শিশুর অস্থিতে মঠ কণ্টকিত হয়েছিল টলষ্টয় এ সমস্তই অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন্ যে পবিত্র কৌমার্য্য জীবন যাপন খুব কম লোকেরই সাধ্যায়ত্ত, বিবাহ সংস্কারের পথ ধরেই সাধারণ লোককে পবিত্রতার আদর্শটা লাভ করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। মানুষের পক্ষে এ পূর্ণ পবিত্রতার আদর্শে উপনীত হওয়া সম্ভব নয় জেনেও যে এই আদর্শটা তিনি সমাজের সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন তার কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে আদর্শ এমন একটা সত্য হবে যেটা দেশ ও কাল-ধর্ম্মের অতীত, যেটা সময়ের কুহেলিজালে উজ্জলতা না হারিয়ে ধ্রুবতারার মত মানুষকে গন্তব্যের পথে ইঙ্গিত করবে।

টলষ্টয়ের এ উপদেশটি ব্যক্তির কল্যাণ কামনায় উচ্চারিত হলেও সমাজের মূল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এর কোনই বিরোধ নাই। স্থির, শান্ত, গভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে তিনি জীবনের মধ্যে একটা মহান আদর্শ ধরতে পেরেছেন জীবনকে একটা প্রকাণ্ড নৈতিক ক্ষেত্রের উপর সংস্থাপিত করেছেন। এই খানেই টলষ্টয়ের সাহিত্য সাধনার সার্থকতা। এই খানেই টলষ্টয় সত্যদ্রষ্টা।

এই জগতে যাঁরা সত্যদ্রষ্টা বলে বরণীয় হয়েছেন যাঁদের শিক্ষা বিশ্বমানবের কল্যাণকল্পে উচ্চারিত হয়েছে তারা সকলেই জীবনকে এক বিশাল সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জীবনের সকল ব্যাপারই তাঁরা সত্যের আলোকে দেখতে চেষ্টা করতেন। তাঁরা সাধনার ফলেই হউক কিম্বা ঐশ্বরিক ক্ষমতার বলেই হউক সত্যের যথার্থ স্বরূপ অনুভব করবার একটা বিশিষ্ট শক্তি সম্পদে ধনী ছিলেন, একে ইংরাজীতে Idealism ও বাংলায় "অধ্যাত্ম দৃষ্টি" বলা যায়। এই অধ্যাত্ম দৃষ্টি না থাকলে পর সত্যানুসন্ধিৎসুর সত্যলাভ হয়

না, শিল্পীর চেষ্টা চরম সাফল্যে সুন্দর ও সার্থক হয় না সাহিত্যিকের সৃষ্টি বস্তু-হীন ছায়ায় কিম্বা প্রাণহীন দেহে পর্য্যবসিত হয়।

বিবাহসংস্কারকে এই Idealismএর আলোকে বা আধ্যাত্ম দৃষ্টির সাহায্যে দেখতে হবে তবেই আমরা এর অন্তর্নিহিত সত্যের সাক্ষাৎ পাব। যারা বলেছেন যে বিবাহের সার্থকতা মাপতে হবে স্বামী স্ত্রীর মিলন জাত সুখানুভূতির তুলাদণ্ডে তাদের এই অধ্যাত্ম দৃষ্টি ছিল না। তাঁরা প্রথমেই যেটা পেয়েছিলেন সেটাকেই চরম বলে মেনে নিয়েছেন তাকে ছাড়িয়ে অতিক্রম করে যাবার শক্তি তাঁদের হয় না তাই তাঁদের এই আদর্শচ্যুতি। এই কার্য্যে আমি সুখ পাই অতএব এ আমার করণীয়, এই কর্ম্মে আমার দুঃখ অতএব ত্যাজ্য, এ হল পশুর Philosophy আর পশুর ethics, আর মানুষের হলেও সে অতি আদিম যুগের, যখন মানব আর পশুতে বেশী তফাৎ ছিল না, যখন সুখ-লালসাই মানবের সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক ছিল। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের একটা নূতন জ্ঞানের উদ্ভব হল যেটা আমাদের কর্ত্তব্য বোধ। এই নূতন জ্ঞানটা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ইতিহাসে এক প্রকাণ্ড আবিষ্কার। সুখবোধের সঙ্গে এর তফাৎ এই সুখ সম্পূর্ণ "ব্যক্তিগত" বর্ত্তমান ও অস্থায়ী কিন্তু কর্ত্তব্য বোধের ইতিহাসটা অনেক বড়-এটা ব্যক্তিগত হয়েও সমষ্টির, বর্ত্তমান হলেও অতীতের সঙ্গে সংবদ্ধ, ও ভবিষ্যতে দৃষ্টি-প্রসারী, অস্থায়ী হলেও চিরন্তনের ধারা। দাম্পত্যবন্ধনকে এই কর্ত্তব্য বোধের ভূমির উপর গড়ে তোলা যায় বটে কিন্তু তাতে করেও—হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের চিরকালের বিরোধের শান্তি হবে না এই ভয়। আমাদের আরও অগ্রসর হতে হবে, সুখ হতে এই যে কর্ত্তব্যে এসে উপস্থিত হয়েছি এইটাই আমাদের খুব বড় লাভ—তবুও এখানে থামলে চলবে না। জীবনের সকল কাজেই সুখ ও দুঃখ জড়িত আছে—এ থাকবেই যতদিন আমাদের অহংজ্ঞান থাকবে (Ego) কিন্তু থাকলেও এ আমাদের Immediate নয়, গৌণ।

বিবাহসংস্কারটাকে Idealismএর আলোকপাতে দেখতে হবে। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমান যুগের একজন শক্তিমতী নারী Eugenist Allen Key তার ব্যবহারিক জ্ঞান ও অধ্যাত্মদৃষ্টির মিলনে একটা প্রকাণ্ড সত্যের উপর দাম্পত্যবন্ধনকে স্থাপন করতে পেরেছেন। ১৯১১ সালে ডাক্তার হ্যাভেলক ইলিস্ লিখিত একটা অবতরণিকা যুক্ত হয়ে এঁর "Love and marriage" নামে গ্রন্থখানি ইংরাজিভাষায় প্রকাশিত হয়।

এই "প্রেম ও পরিণয়" পুস্তকখানায় Allen Key প্রচার করলেন প্রেমই যৌনসম্বন্ধের নৈতিক ভিত্তি, অতএব বিবাহসংস্কারের মূলের কথা। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি শুধু কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর দাম্পত্যবন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত করলে মানুষের হৃদয়টাকে অবহেলা করা হয়। Allen Key প্রেমকেই পরিণয়ের মূলভিত্তি নির্দ্দেশ করলেও এই প্রেমের মধ্যেই তিনি কর্ত্তব্যবোধেরও ইঙ্গিত করেছেন। কর্ত্তব্যজ্ঞানই তার প্রেমের ভিতর সহজ হয়ে ধরা দিয়েছে। তাই তাঁর প্রেমের ধর্ম্মকে আমরা প্রেম ও কর্ত্তব্য এই দুইএর সম্মিলনক্ষেত্র বলতে পারি। এই প্রেমের ধর্ম্মকে তিনি নাম দিয়েছেন Religion of life।— এই ধর্ম্মাচরণে সমাজের মঙ্গল ও ব্যক্তির আত্মচরিতার্থতা এই দুই আদর্শের সামঞ্জস্যস্থাপন সম্ভব্ হয়। বিবাহসংস্কার দ্বারা মানবজীবনকে পবিত্র সুন্দর, মহৎ ও সুখী করেই প্রেমের সার্থকতালাভ হবে আর বিশ্বমানবের হিতের জন্য সমাজের কল্যাণের জন্য সন্তানজনন পালন ও শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতি কার্য্যের মধ্যে কর্ত্তব্যবোধ বিকশিত হয়ে উঠবে। Allen Keyর প্রেম কেবল যৌন সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা নয়; এ হল "Complete expression of the Community between two Personalities চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় (প্রবাসী আষাঢ়, মহিলামজলিস্) "দুই ব্যক্তির সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস পরিপূরক সম্মিলন।" এই প্রেমের দুইটী দিক আছে psychological (মনের দিক) ও physiological (দৈহিক); একেবারে ইন্দ্রিয় সংযোগ বিরহিত বিশিষ্ট মনোবৃত্তি (Plaonic) নয়—কিম্বা কেবল ইন্দ্রিয়সম্ভোগ সংস্পৃষ্টও (Sensual) নয়—এ এমন একটা ভাব যেখানে George Sand এর কথায়, neither the Soul betrays the sense nor the senses the soul, "ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মা প্রতারিত হয় না বা আত্মার দ্বারা ইন্দ্রিয়ও বঞ্চিত হয় না।" (চারুবাবুর অনুবাদ) তবেই দেখতে পাচ্ছি যে Allenkeyর এই প্রেম কেবলমাত্র একটা বিশুদ্ধ মনোবৃত্তি নয়, এই মনোবৃত্তির আংশিকলীলা যা কতকগুলি কার্য্যের মধ্যে পরিস্ফুট হয় সে গুলিও এর অন্তর্গত। এর সঙ্গে আরও একটা ভাব আছে যাকে বিপিনবাবু বলেছেন "আদি রস" (নারায়ণ, আষাঢ়, ১৩২৪)—যে রসের বশে ভালবাসার ধর্ম্ম "আত্মদান, আত্মসাৎ, আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিস্মৃতি" প্রভৃতি একাত্মতালাভের প্রয়াস যৌনসঙ্গমে ও প্রজাসৃষ্টিতে কথঞ্চিৎ সার্থকতা লাভ করে। তবেই প্রেমের ত্রিধারায়—আনন্দলাভের প্রয়াসে যৌনলীলায় সন্তানজননে, কর্ত্তব্যের ধর্ম্মে তার পালন ও শিক্ষাদান

প্রভৃতি কর্ম্মে আর ভালবাসায় (Allen Keyর প্রেম হতে স্বতন্ত্র করে বোঝাবার জন্য)। আত্মজীবনে সত্য ও সুন্দরের সম্মিলন সাধনে, একটী মানবের ভাব ও কর্ম্মজীবনের পূর্ণপরিণতি, আত্মচরিতার্থতা ও সমাজের কল্যাণ সম্পাদন এই দুই আদর্শের বিকাশ সংঘটিত হয়।

এলেন কীর বিবাহসংস্কারের এই প্রেমের আদর্শ বাস্তবিকই ঐ সংস্কার সম্বন্ধে যথার্থ আদর্শ—আর এ যে একটা বিশাল অধ্যাত্মদৃষ্টি ও নৈতিকজ্ঞানের ফল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই প্রেমধর্ম্মের উপর বিবাহসংস্কারকে প্রতিষ্ঠিত করবার যে একটা প্রকাণ্ড সার্থকতা আছে নিশ্চয়ই চিন্তার দিক হতে, সেইটা আমরা বিশেষ করে উপলব্ধি করব,—যখন কিনা এই তত্ত্বের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের একজন প্রধান চিন্তাবীর Henri Bergsonর Creative Evolution তত্ত্বটীর সুসামঞ্জস্য অনুধাবন করতে পারব। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর অভিব্যক্তিবাদ Darwin এর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন হতে Bergsonএর চেতনার অন্তর্নিহিত স্বতঃপ্রসারিণী শক্তির লীলা পর্য্যন্ত সমগ্র তত্ত্বটী প্রকাশ করবার স্থান এ নয়, কেননা এত বড় একটা চিন্তার প্রবাহ অনুসরণ অল্পসময়ে ও অল্পকথায় একেবারেই অসম্ভব। তবে প্রাণের সঙ্গে মনের অথবা চেতনার একত্বকে প্রতিপন্ন সত্য বলে গ্রহণ করে আমরা প্রাণজগতে জীবের ক্রমিক বিকাশের পর্য্যায়ের সঙ্গে মনোজগতে চেতনার বিকাশধারাকে এক অখণ্ড করে দেখে অভিব্যক্তিবাদে প্রেমের যথার্থস্থান অবধারণ করব মনে করেছি।

Darwinএর অভিব্যক্তিবাদ কেবল মাত্র জীবনের ক্রমিক অভিব্যক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মনের ক্রমিক পরিণতির ধারাটা তিনি স্বীয় তত্ত্বদ্বারা পরিষ্কার ব্যাখ্যা করতে পারেন নাই—এ হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর অভিব্যক্তিবাদ অসম্পূর্ণ। তাঁর মতানুসারে আদিম amœbaর হতে বর্ত্তমান মানবদেহ পর্য্যন্ত সমস্তই এক উপাদানে গঠিত। একই জীবকোষ (Germ cell) সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। মনের (Mind) উৎপত্তি নির্ণয় করতে এসে Darwin বললেন যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ধর্ম্মদ্বারা পরিচালিত হয়ে জীবকোষের নিয়ত অসংযত ভাবে নানারূপে প্রকাশ ফলে (Chance Variations) মস্তিষ্কের সৃষ্টি আর সঙ্গে সঙ্গে মন অথবা চেতনার উদ্ভব সম্ভাবিত হয়েছে। এই মত সম্বন্ধে আমাদের প্রথম আপত্তি এই যে, যেখানে প্রাণ আছে, সেখানেই কোন না কোন রূপে মনের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, চেতনা অভিব্যক্তির স্তর নির্ব্বিশেষে সকল জীবকোষের মধ্যেই কিছু না কিছু সংক্রামিত হয়েছেই। দ্বিতীয়তঃ—

জীবকোষের নানারূপে আপনাকে প্রকাশ পরম্পরা স্বীকার করে এই ঘটনাকে মস্তিষ্ক ও মনের উৎপত্তির বিশিষ্ট কারণ ধরলে মানুষের ইতিহাস একেবারে একটা "Chapter of accidents" হয়ে পড়ে।

Bergson প্রচার করলেন যে, অভিব্যক্তিবাদ জীবন ও মন এই দুই ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এ বিশ্বে জীবন ও চেতনা একই তত্ত্ব। এই চেতনাই ক্রমাগত নিজকে অতিক্রম করে উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্তির জন্য ব্যগ্র। চেতনার সেই অন্তর্নিহিত শক্তিই Bergsonর Elan Vital ও কবি Shelleyর "The one Spirit's plastic stress" (Adonais) জীবকোষকে নানা-রূপ পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে মানবদেহ ও মানব মনে বহন করে এনেছে। সৃষ্টির প্রেরণার মূলেই চেতনা অথবা মন, জীবকোষ উপকরণ মাত্র। চেতনার বিকাশের ধারা তিনটী "Vegetable torpor (জড়ত্বভাবত্ব) Instinct (সংস্কার) আর Intelligence (বুদ্ধি)। এই চেতনাই নিজের ধর্ম্মানুসারে ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়ে অবশেষে মানব মনে Intelligence রূপে বিকসিত হয়ে উঠেছে।

এখন প্রেমের বিকাশ-তত্ত্ব। বর্ত্তমান কালের একদল দার্শনিক নীট্‌সে ও তাঁর শিষ্যবর্গ প্রেম ও অন্যান্য কোমল মনোবৃত্তিগুলিকে দৌর্ব্বল্য আর অবনতির কারণ বলে নির্দ্দেশ করেছেন। নীট্‌সে Darwin এর শিষ্য Darwin এর Natural selection তত্ত্বটীর একটা দিক মাত্র উপলব্ধি করে তিনি যে এক ভুল সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। প্রকৃতির যৌনলীলার মাধুর্য্য ও প্রজারক্ষার জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি তিনি একেবারেই প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁর চোখে পড়েছিল শুধু প্রকৃতির ধ্বংস-কারিণী শক্তি ("Nature red in tooth and clow") আর সেই শক্তির অনন্ত বিনাশলীলা। যে Natural selectionএর তত্ত্বের জোরে নীটসে জগৎ থেকে সকল রূপ ও সকল মধুরতা লোপ করে দিয়ে এক ভীষণ হিংসা কামক্রোধ প্রভৃতির কুৎসিততাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, ঠিক সেই তত্ত্বকেই অবলম্বন করে জীবতত্ত্বের (Biology) সাহায্যে আমরা বিশ্বময় সৃষ্টি ও স্থিতি ব্যাপারে এক বিশাল নীতি ("organic morality") ও প্রেমের অনির্ব্বচনীয় লীলা প্রত্যক্ষ করব।

জীব জগতের প্রজনন ও জীব-শিশু রক্ষণ ব্যাপারটা একটু মনের সঙ্গে দেখলে পরেই আমরা জানতে পারি যে বুদ্ধির ক্রমবিকাশের ধারা বেয়ে বেয়ে

জীব যতই স্তর হতে উচ্চ স্তরান্তরে উন্নীত হচ্চে ততই জীবশিশুর আপনা হতে আত্মরক্ষা করবার ক্ষমতাটী কমে যায়; এই ভাবেই মানবশিশুর নিজেকে রক্ষা করবার জন্য অক্ষমতা যত অধিক ও দীর্ঘকাল ব্যাপী এমন আর কোন জীবশিশুতেই লক্ষিত হয় না। প্রকৃতির রাজ্যে এই যে স্তর ভেদে জীব-শিশুদের রক্ষার জন্য একটা সুন্দর সুবিহিত ব্যবস্থা আছে, এই দেখেই সেখানে "organic morality" জৈবিক নীতি নামে একটা শক্তির ক্রিয়া স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। অসহায় মানব শিশু যে রক্ষা পায়, তার নিশ্চয়ই একটা "Survival value" আছে। পিতৃমাতৃস্নেহ ভালবাসা ও যত্ন এই গুলিই শিশুকে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে সহায়তা করে থাকে। এই প্রেমই মানবশিশুর Survival value। এ ভাবে জীবকোষের বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ স্তরের সঙ্গে প্রাণী জগতে প্রেম বিকাশের স্তরটাও সমান পদক্ষেপে চলেছে।

জীবিত থাকাই জীবনের ধর্ম্ম —এর চেতনার—সৃজনীশক্তির প্রেরণায় জীবন ক্রমশঃই এক অবস্থা হতে অবস্থান্তরে উন্নত হবার প্রয়াসী। জীবনের এই গতি ও সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে, তার থেকেই প্রেমের উৎপত্তি। অভি-ব্যক্তিবাদে প্রেমের স্থান কোথায়—নীচের কয়েকটী কথায় তা বুঝতে পারা যাবে "No love, no intellect ; No morals, no man" ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধের এক জায়গায় কবি Shellyর নাম করেছি। একজন বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক বলেছেন যে শেলী গভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে Bergsonএর অভি-ব্যক্তিবাদের (Creative Evolution) তত্ত্বটা পূর্ব্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। বিখ্যাত Adonais কাব্যের কবি গেয়েছেন :—

"The one Spirit's plastic stress sweeps through the dull, dense world, compelling there.

All new successions to the forms they wear." Bergsonএর Elân Vital বা চেতনার সৃষ্টি করবার প্রেরণা ও Shelleyর Plastic stress একই শক্তি ; Bergson যেমন চেতনার এই প্রেরণাকেই সৃষ্টির মূলীভূত কারণ বলেছেন, তেমনি Shelley এই plastic stressকেই রূপপর্য্যায়ের প্রেরক-শক্তি বলে নির্দ্দেশ করেছেন। এ ভাবে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতিতে বা "জীবন দেবতায়" যেমন Darwin প্রভৃতি অভিব্যক্তিবাদীর তত্ত্বগুলি নানাভাবের আলো ছায়াপাতে ইসারা ও ইঙ্গিতে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তেমনি Bergsonর তত্ত্বটাও Shelleyর উপরের উদ্ধৃত লাইন কয়টীতে কবির ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

শেলী প্রেমের কবি। বিশ্বের অন্তঃস্তলে যে প্রেমরাশি সদা সঞ্চিত আর নানানরূপে শব্দ স্পর্শ প্রভৃতির ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যের মধ্য দিয়ে যে প্রেম স্বতঃই নিত্য উৎসারিত, সেই প্রেম তাহার কাব্যে রসসুষমাঁয় প্রতিভাত হয়েছে। শেলীর The one spirit হ'ল প্রেম ধর্ম্ম। আর আমরা পূর্ব্বেই বলেছি অভিব্যক্তিবাদের প্রেম Elan Vitalএরই বিকাশ। মানবস্তরে এসে এই চেতনার সৃষ্টি করবার প্রেরণাশক্তি Elan Vital প্রজাসৃষ্টি ব্যাপারে দাম্পত্যপ্রেমে ও রক্ষণকার্য্যে পিতৃমাতৃ স্নেহে অভিব্যক্ত হয়েছে। Bergsonর নিম্নলিখিত কথাগুলি হতে উপরের তত্ত্বটীর একটা ইঙ্গিত যেন আমরা পেতে পারি বলে মনে হয়।

"At times, however, in a fleeting vision the invisible breath that bears them (the things or individuals) is materialised before our eyes. We have this sudden illumination before certain forms of maternal love so striking and in most animals so touching, observable in the solicitude of the plant for the seed. This love, in which some have seen the mystery of life may possibly deliver us life's secret."

বিংশ শতাব্দীর একটা প্রকাণ্ড গৌরবের জিনিষ এই অভিব্যক্তিবাদ Bergsonর Creative Evolution। এই তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের বিবাহ সংস্কারের প্রেমের আদর্শ তত্ত্বটীর সঙ্গতি কি প্রকারে দেখান যেতে পারে তার একটা চিন্তার সূত্র আমরা এখন খুঁজে পেয়েছি বোধ হয়। এখন নরনারীর সম্মুখে একটা মহান্ আদর্শ স্থাপন করে সমাজ ও ব্যক্তিকে "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্" উপলব্ধি করবার প্রকৃত সহায়তা করেছেন যে এই মহীয়সী নারী (Allen Key) তাঁকে আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই সৌজাত্য বিদ্যা সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রবন্ধ শেষ করলাম।

———

মুক্তি-গাথা

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

কোটি বন্ধনের মাঝে খেলায়ে চাতুরী,
ওগো চিরশিশু, তুমি খেল লুকোচুরী
এ ভুবনে নিশিদিন ; ফেলি যবনিকা
তারি পরে কাটি মিথ্যা বন্ধনের লিখা
আমারে ছলিতে চাও ; করি মোক্ষকামী
করিবারে চাও দূর মোরে অন্তর্যামী
তোমার সান্নিধ্য হ'তে ; তুমি নিশিদিন
যেথায় খেলিছ সুখে বিরামবিহীন
মাখি ধূলিরাশি দেহে, বিক্ষুব্ধ ব্যথায়
সুখে দুখে আনন্দেতে আমিও সেথায়
খেলিবারে চাই প্রভু—তব সৃষ্টিমাঝে
মোর আশেপাশে মোর ক্ষুদ্রতম কাজে
লক্ষ স্থানে তুমি যেগো আছ ধরা দিয়া
সে কথা কেমনে আমি যাব পাশরিয়া !

২

তোমার অজ্ঞাতে আমি করিনিত কিছু
তাই যেন মনে রয় ; মরীচিকা পিছু
ছুটিয়াছি সে ত প্রভু, তোমারি ইঙ্গিতে।
সকলি ভরেছ তুমি তোমারি সঙ্গীতে,
তাইত বুঝেছি কিছু শ্রেয় প্রেয় নাই
এ নিখিল বিশ্বে মোর ; যেই দিকে চাই
তোমার ভঙ্গিমাখানি এমনি দুর্ব্বার
ফুটি উঠে ধীরে ধীরে নয়নে আমার
সব অন্তরালে ; তাই বিজনে নির্জ্জনে
পাতিনি আসন তব ; সব সৃষ্টি সনে

তোমারে সহস্র করি সহস্র মূরতি
জীবন-মন্দিরে মোর চাহিছ আরতি
তোমার সে রূপ হতে বঞ্চিতে আমায়
নাহি সাধ, তাই আমি আছি এ ধরায়।

৩

বন্ধনের মাঝে কভু বদ্ধ নহি আমি
সেই শিক্ষা যেন মোরে দিও অন্তর্য্যামী
জন্ম হতে জন্মান্তরে, তব বিশ্বমেলা
য়েন মোর জীবনেতে তুলি চিরখেলা
রাখে মোরে চিরশিশু করি ; বিশ্বমাঝে
সকলি তোমার, গুপ্ত রহি সব কাজে
ফুটায়ে রেখেছ এই বিশ্বের কমল
তাই এ ভুবনে সব হরষ বিহ্বল।
আমি ত চাহিনা মোর আঁখিদুটি মুদি'
ইন্দ্রিয়ের অন্তরের বাতায়ন রুধি
বিশ্বের আলোক এই ঢাকিয়া আঁধারে
মিথ্যার মাঝার দিয়া লভিতে তোমারে ;—
সত্যময় প্রভু তুমি তব এ ভুবন
তারি রূপ ধরি করে গৌরব সৃজন।

৪

তোমারে দেখেছি কবে কোন্ তরুতলে,
কোন্ স্রোতস্বিনী তীরে কৌমুদীর গায়,
প্রাবৃট পরশ তৃপ্ত মঞ্জু তৃণদলে
সিন্ধুর তরঙ্গমাঝে দক্ষিণের বায়।
তোমারে পেয়েছি মোর দুখ অশ্রুজালে
তোমারে ছুঁয়েছে মোর সুখান্বিত গান,
তোমারে হেরেছি আমি উষার আড়ালে,
আবার সন্ধ্যার মাঝে রক্তিম বয়ান।
তুমি উঠেছিলে হাসি যবে এ ধরায়
আমি এসেছিনু নামি ; রয়েছ গোপন

আমার মরণ মাঝে ; উষায় সন্ধ্যায়
প্রতি পল হেরিতেছি তোমার স্বপন।
আমার কামনা মাঝে তব তৃপ্তি জাগে,
আমি ভালবাসি ধরা তব অনুরাগে।

চিঠির গুচ্ছ।

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

(শেষ দফা)

(১)

(ইংরাজী চিঠির অনুবাদ)

প্রিয়তমে এভি,

তপ্তখোলা হতে লাফিয়ে একেবারে জ্বলন্ত চুল্লীর মাঝে এসে পড়েচি, এভি! ভালোত কিছুই লাগেনা। তুমি ভাবচ, বড়ই অদ্ভুত এ কথা—একেবারে অশ্রুতপূর্ব্ব। তা'হবে। আমিও কখনো শুনিনি। স্বামীর সঙ্গ নারীকে সুখ দিতে পারেনা···আর এমন যে স্বামী! কিন্তু সত্যই বলচি ভাই, আমার এখানে আর একটি দিনও থাকতে ইচ্ছে করে না। যতদিন দিদি তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এখানে ছিলেন, ততদিন বেশ আরামেই কেটেচে। দিনগুলো কেমন করে, কোথা দিয়ে চলে গিয়ে যে দুটো মাস অতীতের কোলে মিলিয়ে দিয়ে গেল, তা' টেরও পেলুম না। দশদিন হল তাঁরা চলে গিয়েছেন, এ বাড়ীর সকল আনন্দ, সমস্ত আকর্ষণ একেবারে নষ্ট করে।

উঃ এই কর্ম্মবিহীন দিনগুলোর কি বুকজাতা বোঝা! কিছুতেই তা ঠেলে ফেলা যায় না। একেবারে শ্বাসরোধ করবার উপক্রম করেচে। কলকাতায় থাকতে যে সব কাজের অভিযোগ করেচি, এখন সেই সব কাজ করতে পেলেই যেন বেঁচে যাই।

স্বামীত খেয়ে উঠে কলেজে বেরিয়ে যান। বারান্দার উপর যতক্ষণ দেখা যায়, তাঁর দিকে চেয়ে থাকি—তারপর ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ি। ঝিটা এসে

তার ভাঙা হিন্দীতে যখন খাবার জন্য তাগিদ সুরু করে দেয়, তখন বিরক্ত হয়ে উঠে যাই। খাওয়া হলে আবার সেই শুয়ে থাকা।

কলকাতায় বই পড়বার ফুরসুত্ পেতুম না, কিন্তু এখানে এসে সেগুলো স্পর্শ করতেও ইচ্ছে হয় না। কখনো যদি বা একখানা টেনে নিয়ে বসেচি—ধৈর্য্যধরে দু-এক পাতার বেশী পড়তে পারিনি। এই বই আর এখন হাত দিয়ে ছুঁইনা। গ্লাসকেসের ভিতর হতে সেগুলো তাদের সোনালু চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে থাকে··· ··· তা' যেন আরও অসহ্য! আমি তাই কাঁচের ওপরকার ধুলো ঝেড়েও ফেলিনে।

স্বামী ফিরে এলে কতটা সময় বেশ কাটে—তারপরই কিন্তু সেই এক ঘেয়ে ব্যাপার। একদিন তিনি বল্লেন—"সমস্তটা দিন বন্দিনীর মত এমনধারা আবদ্ধ থাকলে শেষটায় একটা অসুখ করবে।"

আমি জবাব দিলুম—"কাল থেকে তা' হলে মাঠেই চরতে যাব।"

"তা কেন? আমার সহযোগী অধ্যাপকরা সকলেই বিবাহিত, তাদের বাড়ীগুলো ঘুরে বেড়াতে পার"—বলে তিনি আমার দিকে চাইলেন।

শুনে আমার গা জ্বলে গেল। আমি বল্লুম—"তোমার বন্ধুপত্নীরা আমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুল নন। একথা বুঝতে পেরেও বেহায়ার মত তাদের গায়ে পড়ে আলাপ করতে হবে? সে আমি পারব না।"

"না, না—তা আমি বলচিনে" বলে তিনি আমার হাত দুখানি তার মুঠোর ভিতর চেপে ধরলেন, তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—"কিন্তু তোমার এই একঘেয়ে জীবনে কি করে বৈচিত্র্য আনা যাবে।" আমি এখানে আনন্দ পাচ্ছিনে বলে বেদনায় তিনি ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, তার মুখ চোখ দেখেই আমি তা বুঝতে পারলুম। মনে মনে ভাবলুম, আমাকে খুসি হতেই হবে! ·····কেন পারবনা? এর চাইতে বেশী সুখ-সম্ভার ক'জনার ভাগ্যে জোটে?

আমি তাঁর কাঁধের উপর দু'খানি হাত রেখে বল্লুম—"একটা কিছু খেলার ব্যবস্থা করলে ভাল হয় না?"

আমার মুখে এই প্রস্তাব শুনে তাঁর সমস্ত দুশ্চিন্তা তখনই যেন ঘুচে গেল। তিনি হেসে বল্লেন—"খাসা হয়, কিন্তু কি খেলার ব্যবস্থা করব?"

"টেনিস বেশ চলবে।"

"আমি যে জানিনে" ব'লে তিনি হেসে ফেল্লেন।

'দু-দিনেই তোমায় আমি পাকা খেলোয়াড় করে ছেড়ে দেবো।" এক

সপ্তাহের মধ্যেই খেলার জায়গা এবং সব সরঞ্জাম ঠিক হয়ে গেল। লেখাপড়ায় কৃতিত্ব লাভ করলেও স্বামী কিন্তু খেলাটাকে সহজে আয়ত্ত করতে পারলেন না। দিনকত বেশ আমোদেই কাটালুম। খেলার পর শরীরটা গরম হয়ে উঠলে দুজনা বরাবর রাস্তায় বেড়িয়ে একেবারে রাবীর তীরে গিয়ে ফুলবোনা ঘাসের কার্পেটের উপর বসে আকাশের গায়ে আর রাবীর জলে আলো আঁধারের খেলা দেখতুম।

একদিন ফেরবার পথে আমি বল্লুম—"চল, তোমার কোন বন্ধুপত্নীর সঙ্গে আলাপ করে আসি।"

"না, তার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার কথাই সত্যি—আমাদের তাঁরা পছন্দ করেন না। বন্ধুরা আমার মাঝে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য কিছু খুঁজে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েচেন। অধ্যাপক মহলে আমাদের টেনিস খেলা নিয়ে খুব হাসাহাসি হচ্ছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"তোমায় খুব লজ্জা পেতে হয়েচে, না?"

"সত্যই নীহার, দেশের শিক্ষিত লোকেদের ওরূপ ব্যবহার, লজ্জা হবারই কথা। তুমি নিজে বুঝতে পারচ কি না জানিনা, আমি কিন্তু লক্ষ্য করেচি যে, এই একমাসের নিয়মিত পরিশ্রমে তোমার শরীর অনেকটা ভাল হয়েচে। আমি নিজে কোনদিন শারীরিক পরিশ্রম করিনি, কোনরকম খেলাতে কখনই মন দিইনি। তাই হয়ত চলবার বেলায় মাজাটা আমার নুয়ে পড়ত; এখন কিন্তু চলতে আমার কষ্ট হয় না মোটেই"—বলে প্রমাণ দেবার জন্যই যেন তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

সত্যই খেলার ঝোঁকে সারাটা দুপুর মত্ত হয়ে থাকতুম। কখন স্বামী আসবেন, কখন খেলা সুরু হবে—আর কখনই বা রাবীর তীরে মুক্ত আকাশের তলে গিয়ে বসব—এই সবই ভাবতুম। তিনিও কলেজ থেকে ফিরে এসেই বেয়ারাকে খেলায় আয়োজন করতে আদেশ দিয়ে তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন করে নিতেন এবং জলখাবার ব্যাপারটা সংক্ষেপে সেরে নেবার জন্য দু'তিন খানা করে লুচি একসঙ্গে মুখে গুঁজে দিতেন—আর চা-এর বাটিটা এক চুমুকেই খালি করে ফেলতেন। আমি একা একা হেসে আকুল হতুম—একেবারে ছেলে মানুষটি।

খেলার দিকে আমার খুব ঝোঁক হবার একটা কারণ এই ছিল যে, আমি রোজই জিততুম। আমি খুব মুরুব্বিয়ানা চালে তাঁকে উৎসাহ দিতুম আর

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে পরাজয় মেনে নিতুম; কিন্তু তিনিও ক্রমে নিজের কৌশলে জয়লাভ করতে লাগলেন—সমস্ত শক্তি ও কৌশল নিয়োগেও আমি আর তাঁকে পরাজিত করতে পারতুম না। সেইটেই একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়াল। একদিন বল্লুম—"আর ভাল লাগে না—খেলাও একঘেয়ে হয়ে গেছে।" স্বামীর মুখে আবার বিষাদের চিহ্ন ফুটে উঠল।

সপ্তাহ কেটে গেল একেবারে বিনাকাজে। একদিন সকালে এসে চাকরটা বাজারের টাকা চাইলে। আমি বল্লুম—"চ', আমিও যাব।" সে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি তাকে ধমকে বল্লুম—"নীচে যা, আমি আসচি।" স্বামী পড়ার ঘরে হয়ত নোট লিখছিলেন—আমার কথা শুনতে পেয়ে বল্লেন—"কোথায় যাচ্ছ?"

"চল আজ বাজার করে আসি! কি ছাই ভস্ম সব কিনে আনে, পয়সাও যায় অথচ খাওয়া ভাল হয় না।"

"বেশত, চলনা" বলে তিনি বেয়ারাকে গাড়ী ডাকতে আদেশ করলেন। আমি বল্লুম—"গাড়ী কি হবে; হেঁটেই যাব।"

"সে-যে-অনেক দূর।"

"রাবীর চাইতে ত নয়।" খেলা ছেড়ে দিয়ে অবধি আর রাবীর তীরে বেড়াতে যাইনি। নীচে নেমে এসে, খেলার মাঠের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলুম ঘাসগুলো লম্বা হয়ে উঠেচে। বেয়ারাকে ডেকে বল্লুম "ঘাস কেটে মাঠ ঠিক্ কর।"

স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন—"আজ আবার খেলতে হবে না কি?"

আমি বল্লুম—"হুঁ।"

কিছুদিনের জন্য খেলা আর বাজারে যাওয়া, দৈনন্দিন কাজেই পরিণত হোল।

কিন্তু এত করেও যখন মনটাকে নিরানন্দের জড়তা হতে মুক্ত রাখতে পারলুম না, তখন সব-ই ছেড়ে দিলুম। আজ খেলার মাঠের ঘাস গুলো আধ হাত লম্বা হয়ে বেড়ে উঠছে, চাকর তার বাজার চুরি বাড়িয়ে দিয়েচে—স্বামীর মুখে আবার বিষাদের ছায়া ফুটে উঠেচে। আর আমিও একেবারে জড় হয়ে গেছি। স্বামী আমায় প্রফুল্ল রাখবার জন্য কতরকম চেষ্টা করচেন—কত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা, রাশি রাশি সুপাঠ্য বই। এত আদর, এত ভাল বাসা……

আমার বুক ফেটে কান্নাপায়, এভি—প্রাণ আমার শুকিয়ে মরে গেছে।

এমন কেন হোল, এভি! একি বিবাহের পরিণাম……? কিন্তু বিবাহ ত

আমার চিত্তের স্বাধীনতা হরণ করে নি,স্বামীত দাবীর জোর একটিবারও আমার ওপর চালাতে চান নি…? এখানে যে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত, তবুও, বলতে পার এভি, তবুও আমার অন্তরে এমন দৈন্য, এমন অশান্তি কেন বেড়ে উঠছে?

তোমারই—নীহার।

(২)

প্রিয়তমে,

কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলুম না যে, তোমার চিঠি পড়চি—দু'তিনবার নীচের নামটা ভাল করে দেখে নিলুম। সত্যি করেই লিখেচ?…পরিহাস করনি ত? তোমার চিঠি যে হৃদয়-গলা-কান্নার-সুরের মত এসে আমার বুক ফুলিয়ে দিচ্চে।

সত্যিই জীবন তোমার কাছে একটা দুর্ব্বহ বোঝা বলে মনে হচ্ছে?… কেন? কিসের অভাব তোমার…? আমি ত কিছুই বুঝতে পারচিনে!

তোমার এ-অবস্থা বিবাহেরই ফল কি-না জানতে চেয়েচ। ও-ব্যাপারের সঙ্গে আমার যে পরিচয় নেই। না, না—তা নয়। ও ধারণা ভুল—আগা-গোড়া সব ভুল। এ-সিদ্ধান্তে কেমন করে উপনীত হলুম, শুনবে?

দেওয়ালে টাঙান তোমার ফটোগ্রাফ খানা যেমন স্পষ্ট দেখচি, তেমনি তোমার হৃদয়-খানি আমি দেখতে পাচ্চি আমার হাতে রেশমে-বাধা তোমার লেখা পত্র-গুচ্ছের পাতায়-পাতায়।

কি তোমার হয়েচে? কিছু-ইত না…তোমাকে যে অনেক কিছু করতে হবে। বাংলার মেয়েদের যে মুক্তির বাণী শোনাতে চায়, তাকে এত অল্পে, এমন তুচ্ছ ব্যাপারে বিচলিত হলে চলবে কেন?

একটা ক্ষণিক অবসাদ এসেচে বইত নয়। অচিরেই তা অপসারিত হবে। আমরা ত নদীর তীরে দাঁড়িয়ে শুধু ঢেউ গুণেই সময় কাটিয়ে দিচ্চি—তুমিই যে নারীর বাত্যালোড়িত কর্ম্ম-তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েচ তোমার কৌশলে, নৈপুণ্যে ও সাফল্যে যে ভয়-ত্রস্তা, সতত-সঙ্কুচিতা নারী-চিত্তে শক্তি এনে দেবে। কিছু হচ্চে না বলে তুমি আক্ষেপ করচ, কিন্তু তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার করা-কাজের ভিতরকার সত্যটুকু মানুষের মনে অঙ্কিত হয়ে উঠচে—তাকে আর অগ্রাহ্য করা চলবে না।

টেনিস খেলা,বাজার করা প্রভৃতির মূল্য সেখানে বেশী নেই,যেখানে সকলেই ও-সব করে থাকে; অথবা ও-সব কিছু না করলেই যে জীবনের কিছু পাওয়া

যায় না, তাও নয়। তোমার সমাজের নারীরা যে ওই করেই মুক্ত হবে, তাও আমি বলচিনে। তবুও তোমার টেনিস খেলা, বাজার করা আমি প্রশংসা না করে এই জন্যই থাকতে পারচিনে যে, তোমার সমাজ ও-গুলিকে মস্তবড় অপকর্ম্ম বলে ঘোষণা করেচে—তবুও তুমি সে-গুলো করতে দ্বিধা বোধ করচ না। যতখানি শক্তি অন্তরে সংগ্রহ করে তুমি সে-গুলি অনুষ্ঠিত করচ, সেই শক্তিকেই আমি পূজা করি। ওই শক্তিই তোমাকে বল দেবে সকল রকম বন্ধন ছিঁড়তে, সমস্ত অবিচার দূর করতে। এ হচ্চে শুধু ভাবের দিক হতে তোমার কাজকে সমর্থন করা—শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক হতেও ওর মূল্য তোমাদের কাছে বড় কম নয়।

তোমাদের কাজগুলো যদি এই-দিক হতে ভেবে দেখ, তা'হলে কিছু করচিনে বলে অনুতপ্ত হতে হবে না। ভবিষ্যত-জাতি গড়বার কতবড় একটা দায়িত্ব ভগবান নারীকে দান করেচেন, সমাজ তা'হতে তাকে বঞ্চিত রাখবে?

জীবনের বৈচিত্র্য মানে এ নয় যে, তাকে তারই জন্য সারাদিন ছুটো-ছুটি করে বেড়াতে হবে। প্রাণকে এমন ধারা তৈরি করা চাই, যাতে করে চারিদিক হইতে আনন্দ কুড়িয়ে নিজের ভাণ্ডার সব সময় সে পূর্ণ রাখতে পারে। পাইন গাছটা সম্বন্ধে একদিন তুমিই না এই কথা বলেছিলে?

কল্পনায় একটা অশান্তির জাল বুনে নিয়ে মারুড়সার মত তার মধ্যে নিজকে আবদ্ধ রেখে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি মানুষের মনে কেন আসবে, ভাই? ভগবানের কৃপায় এমন কিছু দুর্দ্দান্ত অভাব তোমায় পীড়ন করচে না, যার ফলে তোমার জীবনের আনন্দ এর মধ্যেই নষ্ট হয়ে যাবে। অসঙ্কোচে তাই-ই করে যাও, যা সত্যরূপে তোমার কাছে প্রকাশিত হবে। আজ এই পর্য্যন্তই রইল। ইতি

তোমারই—এভি।

(৩)

স্নেহের ঠাকুর পো,

কি যে লিখেচ, ভাল করে বুঝতে পারলুম না। জানই ত আমি মূর্খ—আভাসে ইঙ্গিতে কিছুই বুঝি না। নীহারের চিঠিরও ওই একই ভাব। তোমাদের দুটিকে নিয়ে মুস্কিলেই পড়েচি। নীহারের বুকে কিসের ব্যথা

জমে উঠেচে? তার কারণই বা কি? তুমি কি এখনো তাকে কেবল নারীর কর্ত্তব্যই শেখাচ্ছ?

শুনলুম তাকে দিয়ে না-কি টেনিস খেলাচ্ছ, হাট-বাজার করাচ্ছ। সে গুলোও কি নারীর কর্ত্তব্য? যাক্। যাতে তোমরা সুখ পাও তাই-ই কর, আমি তাতেই খুসী।—কিন্তু ব্যথার কথা কেন? কিসের অভাব তোমাদের? টাকা কড়িতে যদি না কুলোয় লিখো, পাঠিয়ে দেব। নীহার ছেলেমেয়েদের একজনকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে লিখেচে—সে না-কি আর একা থাকতে পারচে না। মিনিত শুনেই নেচে বেড়াচ্ছে, সে লাহোর যাবেই—আর খোকাও বাহানা ধরেচে। লোক পেলে আমি ওদের দু'জনকেই পাঠিয়ে দেব।

ভাল কথা, গৌরীর একখানা চিঠি পেয়েচি। তার ওখানে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠচে; অথচ মাথা রাখবার দ্বিতীয় স্থানটুকু নেই। বেচারা কি যে করবে! এ যে বেঁধে মারা! সে লিখেচে—"দিনরাত এই তাচ্ছিল্য সয়ে নির্য্যাতন ভোগ করে আমি থাকতে পারতুম সবই অগ্রাহ্য করে, যদি না ছেলেমেয়েগুলো এত কষ্ট পেত। নিজের আমার কিসের দুঃখ? আমার সবই তো পুড়ে ঝামা হয়ে গেছে। মানুষ যে এমন করে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে—তা আগে কখনো ভাবিনি।"

"এর জন্য দোষ দেব কাকে? বাংলায় আমি একা এমন নই—হাজার হাজার রয়েচে। তারা অনেকেই আমার চাইতেও বেশী যন্ত্রণা পাচ্ছে···কিন্তু অদৃষ্টের দোহাই মেনে বুকের ব্যথা বুকেই চেপে রাখচে।"

"আমি কিন্তু অদৃষ্টের ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিয়ে শান্তি পাইনে। আমার অন্তরে একটা প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেচে। সে আমায় বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, আমার এ অবস্থার জন্য মানুষই বেশী দায়ী; আর সে মানুষ হচ্চে আমারই আত্মীয় স্বজন সকলে। তারা সবাই মিলে যে অস্বাভাবিক নিয়ম করেচে, তাই ত আজ বাধা দিচ্ছে আমাকে এই অনল কুণ্ডের বাইরে ছুটে যেতে। কি চমৎকার বিধান এই-সব মানুষদের। বেঁধে মারবে, ক্ষতস্থানে নূন ছিটিয়ে দেবে, তবুও ছেড়ে দেবে না!"

"ফরিদপুর থাকতে একদিন দেখেছিলুম যে কতগুলি সাঁওতাল মাটি কেটে রাস্তা বাঁধছিল—তাদের দলে মেয়ে লোকও অনেক ছিল। মেয়েরা সন্তানদের কাপড় দিয়ে বেঁধে পিঠে করে নিয়েই মাটি টানচে। স্বামীকে তাই দেখিয়ে আমি বল্লুম—'আহা, কি কষ্ট বেচারীদের।'

তিনি উত্তর করলেন—"চমৎকার পদ্ধতি। নারীকে এরা একেবারে অসহায়া করে রাখে না। দু'মুঠো অন্নের জন্য ওই মেয়েদের আর পরের গলগ্রহ থাকতে হবে না।"

"সে-দিন সে কথা শুনে হেসেছিলুম, কিন্তু আজ সত্যিই ভাবচি প্রকৃত সুখী তারাই। ওই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আমরাও খাটি—তবুও ত কিছু করে উঠতে পারিনে। এরা যদি আমায় পীড়ন না করে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিত, তা' হলেও যেন বাঁচতুম। কোনরকমে হয়ত সন্তান ক'টিকে খাইয়ে বাঁচাতে পারতুম।"

"ছেলে মেয়ে ক'টি একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্চে। শুধু যে খাদ্যের অভাবে তাদের দেহ অপুষ্ট থেকে যাচ্চে, তা' নয়—যে অত্যাচার সইচে, যে রকম জঘন্য প্রকৃতির লোকের সঙ্গে থাকতে হচ্চে, তাতে করে তাদের মনের দৈন্যও বেড়ে উঠচে। এ অবস্থায় থাকতে হলে এদের একটিও মানুষ হবে না! সমস্ত দুঃখ কষ্টের চাইতে সেই চিন্তাই আমায় বেশী ক্লিষ্ট করে ফেলেচে।"

এমন আরো কত কি সে লিখেচে। নরেশের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখো, তার জন্য কিছু করা যায় কিনা। আমরা ভাল আছি। তোমাদের বিশদ খবর জানিয়ো। ইতি।

তোমার—বৌদি।

(৪)

স্নেহের মোহিত,

চিঠি লিখে লিখে জবাব না পেয়ে কনক কিন্তু নীহারের ওপর ভারি চটে গেছে। সেই রাগের ঝাল ঝাড়বার জন্য, তোমার কাছেও চিঠি লেখা সে ছেড়ে দিয়েচে। কিন্তু তুমি আমায় যে চিঠিগুলো লেখ, তার প্রত্যেকখানি না পড়ে সে থাকতে পারে না—আর তাতে তোমাদের দাম্পত্য-জীবনের সব কথা জেনে সে বেচারা ম্রিয়মান হয়ে পড়েচে। অবসর সময়ে কেবল তোমাদের কথা বলে আমায় শুদ্ধ ব্যস্ত করে তুলেচে।

ওদিকে আবার কলকাতা হতে তোমার বউদি, কনকের মারফত, একটা কিছু উপায় বাৎলে দিতে আমায় বারবার অনুরোধ করচেন। তাঁর বিশ্বাস, তোমার সুখ-দুঃখের সোণার আর রূপোর কাঠি দুটো আমার হাতের সামনেই রয়েচে—একটু কষ্ট করে সে দুটোকে যায়গা মাফিক বসিয়ে দিতে পারলেই তোমাকে সুখী করতে পারি।

বাস্তবপক্ষে তোমাদের অবস্থাটা বাইরের দিক হতে আমাদের কাছে বড়ই শঙ্কাজনক বলে মনে হচ্চে। তোমার চিঠিগুলি পড়ে আমি একটা কিছু ব্যবস্থা করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েচি—কিন্তু মগজে কিছুই যোগায় না।

তোমায় আগে একবার লিখেছিলাম যে, কর্ম্মের একটা উদ্দাম প্রেরণা দেশের তরুণ-তরুণীদের বুকে চাঞ্চল্য এনে দিয়েচে। তার ফলে জীবনের কোন অবস্থার মাঝেই তারা আজ শান্তি খুঁজে পাচ্ছে না! ছাত্র ছাত্রীরা পড়বার শ্লোক আওড়াতে বসে, তার মাঝে জীবনের নতুন রাগিণীর আলাপ শুনতে না পেয়ে, তোতার মত মুখস্থ করেই যাচ্ছে—যুবক যুবতী তাদের আরব্ধ কাজের মাঝে আনন্দের লেশমাত্র অস্তিত্ব দেখতে না পেয়ে, পেটের দায়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কাজ চালাচ্ছে। পড়ার অবসরে, কাজের ফাঁকে হঠাৎ যখন তাদের অন্তরের আনন্দ সঙ্গীত বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে রিণ রিণিয়ে বেজে ওঠে, তখন-ই তারা বই দুঁড়ে ফেলে, কাজের বোঝা ঠেলে রেখে মুক্ত হয়ে ছুটে যেতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। দু'চার জন করেও তাই—কোনদিকে না তাকিয়ে একেবারে ছুটে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সবাই কিছু তা পারে না—দো-টানার ভিতর পড়ে জীবনের আনন্দকে একেবারে হারিয়ে বসে।

এদের জীবন সার্থক করতে হলে এদের পড়বার ও করবার এমন বিষয় নির্ব্বাচন করতে হবে, যার বোঝা হবে হাল্কা আর যার সঙ্গে মাখা থাকবে তাদের জীবনের আনন্দ।

নীহার যে দো-টানায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্চে, তাতে করে তার মনের কাদা সব তলিয়ে যাবে—আর মাতৃত্বের স্বর্ণ সরোজ শতদল মেলে ফুটে উঠে সৌন্দর্য্যে সৌরভে তার দেহমন মাতিয়ে দেবে। এমনি একটা পরিবর্ত্তন যতদিন না তার ওপর কাজ করচে, ততদিন সবাই মিলে চেষ্টা করেও তাকে সুখের সন্ধান বলে দিতে পারবে না।

ভাল কথা। তোমাদের গৌরীদেবী তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক সপ্তাহ হ'ল এখানে এসেছেন। আমাদের এখানে নতুন ধরণের একটা বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েচে—আমিই তার সম্পাদক। একজন শিক্ষয়ত্রীর প্রয়োজন হওয়ায় আমি তোমার বউদিকে লিখি যে, গৌরীদেবী সে কাজ গ্রহণ করবেন কি না! জবাব স্বরূপ গৌরীদেবীর আবেদন এসে হাজির হল। আমরা তাকেই নিয়োগ করলাম। তিনি তার ভাইদের মতের বিরুদ্ধেই এ কাজ গ্রহণ করচেন। এখানে তার থাকবার ব্যবস্থা ইস্কুল হতেই করা হয়েচে,

আর মাইনেও আপাততঃ চল্লিশ টাকা স্থির হয়েচে। ছেলে মেয়েদের নিয়ে তিনি একরকম মন্দ থাকবেন না। কনকের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েচে—তিনিও তার "দিদি"। কাজেই মাঝ থেকে আমিও খানিকটা অপ্রত্যাশিত স্নেহ কুড়িয়ে পাচ্ছি—সে জিনিষটা বড়ই উপভোগ্য।

গৌরীদেবীর এই নতুন জীবনে লক্ষ্য করে দেখবার অনেক কিছুই আমি পেয়েচি। হিন্দু বিধবা গৃহকোণেই অভ্যস্থা—নতুন সমাজে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের কাজে ব্রতী হয়ে একটা সঙ্কোচে আড়ষ্ট থাকবেন, এইরূপ আশঙ্কাই করেছিলাম; কিন্তু তাঁর সহজ সপ্রতিভ ভাব দেখে সত্যিই আমি বিস্মিত হয়েচি। তাঁর প্রতি যত লোকের যেমন অবিচার এতদিন অবাধে চলে এসেচে, তেমন অনেক ক্ষেত্রেই হতে দেখা যায় না—অথচ দীর্ঘ দিনের এই নিষ্ঠুর অত্যাচার তাঁকে জীবনে-মরা করতে পারে নি। হাসিমুখে কর্ত্তব্য কাজ করে প্রাণভরা তৃপ্তিলাভে তুষ্ট হচ্চেন—প্রগলভতা বা কোনরকম আতিশয্য তাঁর কাছেও ঘেঁসতে পারচে না।

হাঁ, আর একটা কথা। তুমি অনেকবার অনুযোগ দিয়েচ যে, কনকের কথা চিঠিতে আমি কিছুই লিখিনি। আমার কিন্তু মনে হয় তার সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি, তার চাইতে কিছু কম তুমি জান না। একটা কথা শুধু অসঙ্কোচে আমি বলতে পারি যে, পরস্পরকে আশ্রয় করে আমরা দু'টি প্রাণী বেশ আরামেই আছি। আর সে আরামের নেশা আমাদের দু'জনাকে এমনই মশগুল করে রেখেচে যে, একটি দিনের তরেও আমরা পরখ করে দেখতে প্রবৃত্ত হইনি আমাদের স্বাভাবিক অধিকার কোথাও খর্ব্ব হয়েচে কি-না।

বাংলার তরুণীরা সব কনকের মত হলে বাঙালীর দুঃখ ঘুচবে কি-না বলতে পারিনে—তবে কনককে অন্যরকম করে গড়তে চাইলে তার জীবনটাকে যে নষ্ট করে দেওয়া হবে সেটা নিশ্চিত। কেমন আছ লিখো। ইতি।

তোমারই
নরেশ।

সমাপ্ত।

দুর্গোৎসব

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী]

কোথা হ'তে আজ, নিখিল ভাসাল
এ নব হরষ বরষা!
যৌবন ভরা শ্যামলা প্রকৃতি
সে প্লাবনে যেন বিবশা!
আজি, একি এ মহান্ দৃশ্য,
কার গুণ গাথা গাহে বিশ্ব,
পূর্ণাতটিনী আজি গো কাহার
চরণ পরশ-সরসা!
কাহারে পূজিতে অর্ঘ্য সাজায়ে
পূজারিণী-ধরা বিবশা!
অনলে ওই যে আপনা সঁপিয়া
অগুরু বিলায় সুরভি,
কাহার কণ্ঠে মাল্য হইতে
ঝরিছে গরবী করবী!
আজ, কুসুমে নব সুগন্ধ
মর, ভুবনে একি আনন্দ!
বন্দনা রচে মধুর ছন্দে
ওগো মা! তোমারি সুকবি
দিকে দিকে আজ নব জাগরণ
ধূপ ধুমে নব সুরভি!
মাগো, শিহরে পুলকে কদম্ব মরি!
স্মরিয়া ও পদ লাবণি!
অশ্রুতে ভাসি' শিরীষ শেফালি
নীরবে চুমিছে অবনী!
একি এ দীপ্তি আকাশে,
তোর, আগমনী বাজে বাতাসে,

কোন্ অপ্সরী খুলিল গো তরী
আজিকে সলিল বিলাসে ?
কি মন্ত্রে আজি জাগিয়া ভারত
চাহিছে ব্যাকুল চাহনি !
নিখিল ভাসাল মাগো, তোরি রাঙ্গা
পদ নখ-কণ-লাবণি !

মায়াবাদ ও অদ্বৈত তত্ত্ব।

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী]

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন কর ভাদ্রের নারায়ণে আমার সমালোচনা করিয়াছেন। অবশ্য আমার ভ্রান্তি দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি যে সব প্রমাণাদি উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে আমি আমার কথার সমর্থন লাভ করিয়া সুখী হইয়াছি। আর সকলকে সে সুখের ভাগী করিতে হইলে তলাইয়া বিচার করিতে হইবে। কিন্তু বিচারগৃহের প্রবেশ দ্বারে এক গাদা fallacyতে আমি ঠেকিয়া পড়িলাম। সেগুলি সরাইতে হইবে।

প্রথম, Argumentum ad populum, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির উপর ত দেশের লোক হাঁড়ে চটিয়া রহিয়াছে। সুতরাং প্রতিপক্ষের মতটা প্রচলিত শিক্ষার কুফল বলিয়া প্রচার করিয়া দিলে অতি সুলভে যে একটা এক তরফা ডিক্রি নির্ব্বিচারে বা অবিচারে পাওয়া যায় উপেন্দ্রবাবু এ প্রলোভনটা সম্বরণ করিতে পারেন নাই, তা তিনি যতই সাধনভজনশীল ত্যাগী ও জড়বুদ্ধিবিহীন হউন না কেন। বিচারের শেষে কথাগুলি বলিলে না হয় একটা সার্থকতা পাওয়া যাইত। কিন্তু প্রথমেই ইহার অবতারণা পাঠকবর্গকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। উপেন্দ্রবাবু ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা ও দার্শনিক তত্ত্বভাণ্ডারকে এত শূন্যগর্ভ মনে করিলেন কেন যে বিশেষ কোন অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ গ্রহণ না করিলেই আর কিছু গ্রহণ করিবার থাকিত না ? শঙ্করের মায়াবাদ কি সে ভাণ্ডারের শতরত্নের একটী রত্ন নহে ? দেশে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার বহুশতাব্দী পূর্ব্ব

হইতেই সেই ভাণ্ডারে মায়াবাদের শত প্রতিবাদ সঞ্চিত হইয়া নাই কি ? বঙ্গদেশ মায়াবাদ ধার করিয়াছিল। মায়াবাদের জন্মস্থানে ইহার তীব্র প্রতিবাদাত্মকবাদ সকল পাশাপাশি বিবাদ করিতেছে নাকি ? সমালোচক মহাশয় কি খবর রাখেন যে দাক্ষিণাত্যে দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদীর জল স্পর্শ করে না ! যাঁহারা বলিয়াছিলেন "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বুদ্ধমেব তৎ" তাঁহাদের মাথাও কি ইংরাজী শিক্ষায় বিকৃত হইয়া গিয়াছিল ? উপেন্দ্রবাবু কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে এই বাঙ্গালাতেই সাতদিন বেদান্তের মায়াবাদী ব্যাখ্যা করিয়া কোন সাড়া না পাইয়া সার্ব্বভৌম যখন বলিলেন,

"তুমি শুনি শুনি রহ মৌনমাত্র ধরি ॥
ইহার উত্তরে প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল ॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সংশয়চ্ছেদিবাক্যে চৈতন্যদেব উত্তর দিলেন,

"জীবনিস্তারের হেতু সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥"

তারপর আরও আছে—

"আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল ॥" (চৈঃ চঃ)

আমরাই দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কল্পনা শব্দটাকে বড় করিয়া দিলাম। আশা করি উপেন্দ্রবাবুও বোধ হয় এখন আর সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না যে তাঁর 'নেতি' শাস্ত্র গ্রহণ করিতে না পারিলেই তাহা জড়বাদীর ধারণামাত্র হয়, অথবা চৈতন্যদেবও পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রভাবে আত্মকেন্দ্রচ্যুত হইয়া মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর পাশ্চাত্য শিক্ষাতেও যে মানুষ শ্রদ্ধাহীন হয় না তার প্রমাণ ত উপেন্দ্রবাবু নিজেই। তবে এ স্ববিরোধ তিনি করিলেন কেন ? আমারও বিশ্বাস ও বন্ধুরাও তাই বলিয়া দিলেন যে, তিনি কোন অ-ইংরাজী টোলের অধ্যাপক নন। অথবা অনুমানেরও প্রয়োজন নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণই বর্ত্তমান। তিনি বিলাতে আপিল করিয়াছেন। সুতরাং ইংরাজীপড়ো হইলেই যে শ্রদ্ধাহীন হইতে হয়, তিনি নিজেই তাঁর সেকথার প্রতিবাদ !

দ্বিতীয় fallacy এই বিলাত্ আপিল। আমি এ কথা বলিনা, যে আমাদের আলোচনায় স্বমতপোষক কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের যুক্তি আমরা ব্যবহার করিব না! কিন্তু এ আপিল তা নয়। ইহা স্বমতের স্বপক্ষি বিলাতীপণ্ডিতের প্রশংসাপত্র। যুক্তি নয়। কিন্তু উপেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁর একখানা সার্টিফিকেটের জায়গায় যদি আমি পাঁচখানা নিন্দাপত্র প্রকাশ করি, তাহলে কি তিনি পরাজয় স্বীকার করিয়া গৃহে ফিরিবেন? তা যখন নয়, তখন ইহার নাম দিলাম আমি বিলাত আপিল fallacy। এক শ্রেণীর পাঠকের অজ্ঞতাকে আলোচনা বাণিজ্যের মূল ধন করা হয় বলিয়া ইহাকে Argumentum ad ignoratiam বলাও চলে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটে ফল ফলিয়াছে বিপরীত। তিনি স্বমত পোষক বলিয়া মোক্ষমূলের শরণাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নজির তাঁহারই বিরুদ্ধ পক্ষ স্থাপন করিতেছে। তৃতীয় fallacy হইয়াছে সুতরাং সোজাসুজি Ignoratio elenehi. আমি "জড়বুদ্ধি" বশতঃ বুঝিতেই পারিলাম না উপেন্দ্রবাবু এ উক্তি উদ্ধার করিলেন কেন? * পণ্ডিত প্রবর মোক্ষমূলের প্রশংসা করিয়াছেন The true Vedanta Philosophy'র বেদান্ত ফিলসফি মাত্রেরই নয়। আমরা দেখিয়াছি চৈতন্যদেব নিজেকে বেদান্তবাদী বলিয়াও শঙ্কর বেদান্তকে নাস্তিকতাদোষে দুষ্ট করিয়াছেন, ইহার মধ্যে কোনটা True vedanta? একটা অবশ্যই false. কোনটা true, তা পণ্ডিতবর স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন, যে বেদান্তে Subject ও object এর সমন্বয় আছে। 'কার্য্যকারণ' এবং 'অহং ইদং' এর একত্ব আছে। সমালোচক মহাশয় বুঝিতেই পারেন নাই যে মোক্ষমূল'র যাহাকে বলেন True Vedanta তাহা তাঁহার মায়াবাদ বিধ্বংসী। এই জন্যই ত বলিয়াছি ignoratio clenchi. মোক্ষমূলর স্তুতি বা করিলেন কার গ্রহণ বা করে কে? সে কালের সেই শীতলাবাহীরও এই ভ্রম ঘটিয়াছিল। শঙ্কর বেদান্তে Subject সৎ object অসৎ। অহং' এর স্থাপনা আছে, ইদং নিরাকৃত। মায়াবাদের ব্রহ্ম কার্য্যও নহেন কারণও নহেন। একটা হাঁ, একটা 'না'; অথবা দুইটাই না একত্র যোগ করিলে একটা tremendous' শূন্য পাওয়া যাইবে না কি? Synthesis হল উত্তম। সাধে কি শ্রীচৈতন্যমায়াবাদকে নাস্তিক্যবাদ বলিয়াছেন। তবে সে কথা পরে। আচার্য্য

* It (The True Vedanta Philosophy) rests chiefly on the tremendous Synthesis of the subject and object, the identification of cause and effect of the "I" and the "It" উপেন্দ্র বাবুধৃত মোক্ষমূলর বচনের কিয়দংশ।

শঙ্কর আরম্ভও করিয়াছেন **এক** লইয়া শেষও করিয়াছেন **একে**, দুই কোথায় যে Synthesis হইবে? তাঁর উপর Synthesis আরোপ করিতে গেলে তাঁর সেই মোহনীয় বুদ্ধিমত্তার উপর যে একটা tremendous কটাক্ষ করা হয় তাকি উপেন্দ্রবাবু একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই? তবে তিনি নিজে যে একটা সমন্বয় গড়িয়াছেন তাহা কতটা তাঁর নিজেরই মতের সঙ্গে সুসঙ্গত ও যুক্তিসহ তাহা যথাস্থানে বিচার করা যাইবে। চতুর্থ fallacy তাঁর তিনি এক জায়গায় ধমক দিয়া বলিয়াছেন, জগন্মান্য ঋষিদিগের কথা না মানিয়া অবিদ্যার দাস তোমার কথা মানিব? আমি যেন এরূপ ধৃষ্টতার কাজ বাস্তবিকই করিয়াছি। যাহারা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র আমি তাঁহাদের উপরে আপনাকে স্থাপন করিতে চাহিতেছি এই ভাব শ্রোতৃবর্গের মনে উদ্রেক করিয়া দিতে পারিলে সহজেই যে আমার উপর তাঁর জয়লাভের আশা আছে এই অভিসন্ধি তাঁর "বিদ্যার" ঠ্যালা খাইয়া মনের এক কোণে যাইয়া লুক্কায়িত যে নাই সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না; উপেন্দ্রবাবু মনে রাখিবেন, এ দেশের বামাচারী তান্ত্রিক-গণও উপনিষদের ঋষির দোহাই দিয়াই আপনাদের অনাচরগুলি চালাইয়া দিয়াছিল। উপনিষদ্ ত বেওয়ারিশ মাল। এ দেশের বিরুদ্ধ সম্প্রদায় সকলে একই শ্লোককে আপনাদের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা বা কু-ব্যাখ্যা করিয়া চিরদিন শ্রুতির সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের হুবহু দ্বৈতবাদ পক্ষীয় ব্যাখ্যাও বহুদিন হইল চলিয়া আসিতেছে। সকল সম্প্রদায় ইহাকে মহাবাক্যও বলে না ("তত্ত্বমসি জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য'—চৈঃ চঃ) মায়াবাদীর ব্যাখ্যাই কি: সকলে স্বীকার করে? চৈতন্যদেবের সাক্ষ্য গ্রহণ করুন—

"মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা!
অভিধা বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যেই অর্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন॥ (চৈঃ চঃ)

এখন উপেন্দ্র বাবু বুঝুন, তিনি যে ভাষ্যাঞ্জন স্পর্শে রাহু মুক্ত করিয়া পূর্ণচন্দ্র দেখার বাকাচ্ছটা বিস্তার করিয়াছেন, চৈতন্যদেব সেই ভাষ্যকে সূর্য্যেরও

আবরক মনে করেন। সুতরাং ভাবিয়া দেখুন যুক্তি ছাড়িয়া authorityর উপর নির্ভর একান্ত নিরাপদ নহে। তিনি যে "সচ্চিদানন্দ" শব্দের তিন অংশে একার্থ আরোপ করিয়া স্বমত ভেদও নিরসন করতঃ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত তত্ত্ব স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন বৈষ্ণব বেদান্ত কিন্তু সেই স্থানে তিনে এক, একে তিন, রূপ দ্বৈতাদ্বৈত প্রমাণ করেন—

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়॥
সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥ (চৈঃ চঃ)

সুতরাং উপনিষদ্‌কে স্বমতোপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করিলেই হইবে, সে ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত কি না তাহাই প্রধানভাবে দেখিতে হইবে। কেবল যে প্রাচীনেরাই মায়াবাদী ব্যাখ্যা স্বকপোল কল্পিত বলিয়া দোষ দিয়াছেন, তা নয়। নবীনেরাও এই অপবাদ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ঘোষ, যাঁহার শ্রৌতশাস্ত্রে প্রবেশ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই এবং যাহার কোন দর্শনটোলের বিশেষ মতামতের বিপক্ষতা বা পক্ষপাতিতা করিবার,কোন গরজ বা বালাইও নাই, জুলাই মাসের Modern Reviewতে "Jivatman in the Brahma Sutras" এই গ্রন্থের সমালোচনায় বলেন,—"If primality and finality be attirbuted to the Sutras, Sankara's Commentary will, we admit, appear in some places as forced and artificial. But if the Upanishads be accepted as primal and final, we must, in many places, charge Badrayana and Sankara (both ?) with misrepresentations. The Vaishnava Theologians could not accept the absolute monism of the Upanishads and so had to depend upon Badrayana. If he did not suit them they would fall back upon some other resources. সুতরাং বেওয়ারীশ মাল উপনিষদ ও তাহার ব্যাখ্যা লইয়া সম্প্রদায় সকলের মধ্যে যখন এমনি কাড়াকাড়ি (Scramble) তখন প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রুতি বাক্যের ধমক্ আজ কালকার দিনে কতটা সময়োপযোগী তা বলা কঠিন। তবে ধমক্

দিবার যোগ্যতা উপেন্দ্র বাবুর কত এবং আমার প্রতি ধমক্‌টা কিরূপ ন্যায়-শাস্ত্রানুমোদিত তা যথাস্থানে নির্দ্দেশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

সমালোচনা অতি অপ্রীতিকর কার্য্য, তা যদি আবার কোন পূজ্যপাদ ব্যক্তির সমালোচনা হয়। প্রাচীন কালের যাহাদের স্মৃতি মানুষ ধরিয়া রাখিয়াছে তাঁহারা বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য আসিয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর আসিয়াছিলেন বৌদ্ধ-নাস্তিকতা দলনের জন্য। একদিকে দ্বৈতবাদী সাংখ্য অন্যদিকে শূন্যবাদী বৌদ্ধ—এ দু'এর সঙ্গে বিবাদে, অদ্বৈত তত্ত্বের উপর যে বিশেষ জোর (Emphasis) দিতে হইয়াছিল, অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও সেই ঝোঁক্‌টাকে ধরিয়া রাখিতে গেলে জগদ্বিবর্ত্তনের বিরুদ্ধ মুখে চলিতে হয়। সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে আচার্য্য শঙ্কর যে আসনে বসিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন তাঁহাকে সেই আসনেই বসাইয়া রাখিলে তাঁহার মধ্য হইতে জীবন বাহির করিয়া লইয়া তাঁহার কাষ্ঠমূর্ত্তির পূজা করা হইবে। মৃত গ্রহণ করে না, যেমন তেমনই থাকে। না হয় নষ্ট হইয়া যায়। জীবিতই গ্রহণ করিতে ভয় পায় না। সে নূতন গ্রহণ করিয়া আবেষ্টনের উপযোগী হয় ও দিন দিন বড় হইয়া উঠে। আমরা মধ্যযুগে যাইয়া শঙ্করের পূজা করিব কেন? তাঁর দর্শনের উপর নূতন রং ফলাইয়া যুগোপযোগী করিতে পারি না কি? তাহাতেই উহার প্রাণের পরিচয় পাইব। নতুবা পুরাতন পুতুল কেহ গ্রহণ করিবে না। তবে এ কথাও ঠিক্ এই বিংশ শতাব্দীতেও দশম শতাব্দীর লোক বিচরণ করিতেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিচয়ের পরিবর্ত্তনে নূতন তত্ত্বের (Data) আবির্ভাব হয়। তাহা স্বীয় অঙ্গীভূত করিয়া লইবার শক্তি যে systemএর নাই তাহা মৃত, জীবন্ত মানুষ বেশী দিন তাহা ব্যবহার করিতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে Rationalismএর সঙ্গে বিবাদ করিতে যাইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ এক রকম Agnosticismএর আশ্রয় লইতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, আজ তাঁহারা সেই Rationalismকেই আত্মরক্ষার বর্ম্মরূপে গ্রহণ করিতেছেন। তাই বলিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর খৃষ্টান পাদ্রী এখন নাই তা কে সাহস করিয়া বলিবে? মহাত্মা গান্ধী বলেন, শঙ্কর ও চৈতন্য উভয়েরই প্রভাব দেশের উপর অসীম। অথচ একজন আর এক জনকে বলিয়াছেন নাস্তিক। শুষ্ক তান্ত্রিক আচারে দেশ যখন মরুভূমি, ভক্তির বন্যা আসিয়া সব ভাসাইয়া দিল, আত্মা তৃপ্ত হইল। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় যাহা চাই, পাইলাম।

অন্ত কোনদিকের বিচার উঠিল না—সে দিকে দৃষ্টি এখনও যে পড়ে নাই অবস্থার বিবর্ত্তনে নূতন সমস্যার আবির্ভাবে আমরা যে ঐ-টুকুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা কোথায়? দেশের লোক যখন না খাইতে পাইয়া মরিতেছে, খাইতে পাইবে সে আশাও করিতে পারিতেছে না, তখন মহাত্মা বলিলেন—আমার অনুসরণ কর, খাইতে পাইবে। অমনি সে কথা কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল। দলে দলে লোক তাঁহার পশ্চাতে ছুটিল, কোথায় যাইতেছে ভাবিলও না। অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দাও, ও-ডাক কাণেও পৌঁছিবে না। তখনকার কাজ সে সময়কার জন্যই অক্ষয় হইয়া রহিল। যুগ পরিবর্ত্তনে মানুষের মনে যে আকাঙ্ক্ষা আসে, তার যে নূতন অভাব উপস্থিত হয় তদনুসারে প্রয়োজন হইলে ডাকের উপকরণ ও প্রকরণ দুই-ই বদ্‌লাইতে না পারিলে সাড়া চিরদিনই মিলিবে না। বুদ্ধের ডাকে একদিন যে সাড়া মিলিয়াছিল, আজ তা আছে কি? মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যে nationalismএর ডাকে য়ুরোপের জাতি সকল মাতিয়া উঠিত আজ তাহাতে ভাটা ধরিয়াছে। তাই বলিয়া এ সকলের কি স্থায়ী মূল্য নাই? আছে যদি ইহাদিগকে নবতর উচ্চতর synthesisএর অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পার। মানুষ তার মতের অনেক উপরে উঠিতে পারে। আমরা আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদের সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি বটে কিন্তু আচার্য্যের কাছে ধর্ম্ম বা সত্যের ঋণ যে অপরিশোধ্য, যাহা ইতিপূর্ব্বে স্থানান্তরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ আর করিব না। মাত্র এই কথা বলিয়া বিচার প্রবেশের পথ পরিষ্কার করিয়া লই যে আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধায় আমি কাহারও অপেক্ষায় পশ্চাৎ পদ তাহা স্বীকার করি না, অন্ধভক্তিকে আমি শ্রদ্ধা মনে করি না, অশ্রদ্ধাই মনে করি। তবে যদি ভাষার ধরণে (styleএ) কোন দোষ ঘটিয়া থাকে তবে করযোড়ে পাঠকগণের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করি—মানুষ আপনার ছায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না।

বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া উপেন্দ্র বাবু বিগত ফাল্গুনের প্রবাসীতে প্রকাশিত আমার একটী অতিক্ষুদ্র প্রবন্ধ—শঙ্কর ও স্পিনোজা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বিচার করিবার পূর্ব্বেই সে সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সারিয়াছেন। সুতরাং টিপ্পনি নিষ্প্রয়োজন। তবে তিনি যে পাঁচটি পূর্ব্ব পক্ষ করিয়াছেন তাহার আলোচনা করিলেই চলিবে।

(১) অদ্বৈততত্ত্ব ও মায়াবাদ যে পরস্পর বিরুদ্ধ সে কথার উত্তর উপেন্দ্র-

বাবুই স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। মায়া কেবলমাত্র বিদ্যার অভাব নয়, কিন্তু আবরণী বীজশক্তি—তাঁহার এই স্বীকারোক্তি অদ্বৈতত্ত্ব বিনাশ করিতেছে। মায়ার যখন সত্তা আছে, সে সত্তা ব্রহ্মের অন্তর্ভূত হইলে স্বগতভেদ আসে, বাহিরে হইলে দ্বৈত হয় ও ব্রহ্মের অসন্তত্বে ব্যাঘাত ঘটায়। এই মাত্র বলিলেন, মায়া কেবলমাত্র বিদ্যার অভাব নহে। সে নিশ্বাস শেষ না হইতেই সুর ধরিলেন, উহা 'সৎ' নহে। আবার সে নিশ্বাসও পড়িল না, বলিয়া উঠিলেন, "সদসৎ শব্দ দ্বারা অনির্ব্বার্য্য মায়াশক্তি।" শক্তি শব্দদ্বারা বাচ্যা যখন তখন 'অনির্ব্বাচ্যা'ও 'অসৎ' না হইয়াই যায় না? এমন না হইলে কি দর্শন শাস্ত্র গড়া যায়? একবার বাগ্‌বাজারের সুরসিকেরা তর্ক বিতর্কর পর মীমাংসা করিয়াছিল, "মাছেরা কি গরু না যে জলে আগুন লাগ্‌লে তারা গাছে উঠ্‌বে?" উপেন্দ্রবাবু বলেন, অনাদি "মায়ার অন্ত আছে বলিয়া তাহা সৎ নহে। অতএব মায়াবাদ দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ত্ব কোনও রূপে ব্যাহত হয় না।" সমালোচক মহাশয় নিজের যুক্তিটিও তলাইয়া দেখেন নাই। এই যুক্তিটিতে অনাদিকাল হইতে 'অন্ত' না হওয়া পর্য্যন্ত মায়াকে 'সৎ' বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল, এবং যতদিন না 'অন্ত' হয় ততদিন ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ত্বকে ব্যাহত করিতে তাহার কোন বাধা রহিল না। কোন সময়ে তার 'অন্ত' হইবে—এই উক্তিই প্রমাণ করিতেছে যে মায়া আছে অর্থাৎ 'সৎ'। যা নাই তার সম্বন্ধে সে অনন্ত নয় এই কথা খাটে না। যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ইহার পারমার্থিক সত্তাই স্বীকার করিতেছ। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নয় নশ্বর। চৈতন্যদেবও এই কথাই বলিয়াছেন—"জগৎ যে মিথ্যা নহে নশ্বর মাত্র কয়।" এ সত্তা ব্যবহারিক বলিতে পারিবে না। কেন না ব্যবহারিক ভাবে সংসারবৃক্ষের 'অন্ত' নাই। লক্ষ লক্ষ অমুক্ত জীবের জন্য মায়াশক্তির কার্য্য অনন্ত কাল চলিবে। তাই জন্যই উপনিষদ বলিয়াছেন, "এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।" কথাটা আরও একটু বিশদ্ করিয়া বলি।—ব্যবহারিক সত্তার 'অন্ত' নাই, মায়ার 'অন্ত' আছে; সুতরাং মায়া ব্যবহারিক সত্তা নহে। মায়া হয় ব্যবহারিক, না হয় পারমার্থিক; কিন্তু মায়া ব্যবহারিক নয়, সুতরাং মায়া পারমার্থিক। ইহাকেই বলে, উল্টা সমঝ্‌লি, রাম! বলি, যার অস্তিত্বই নাই তা লইয়া এত বিব্রত কেন? মুখে যতই বলা হউক না কেন যে এই জগৎব্যাখ্যা কেবল ভ্রান্ত জীবের জন্য, পরমার্থতঃ কিছু নয়। কিন্তু পরমার্থতত্ত্বও ত জীবই জানিতে চায়। তাই, তার জ্ঞানের কাছে যা সত্য বলিয়া প্রকাশিত হয় তাকে মিথ্যা বলিলে, থাকে

বল পরমার্থ সত্য তার সত্যতার প্রমাণ করিবে কিসের জোরে? তারও দাঁড়াবার স্থান থাকবে না—সে abstract হয়ে যাবে। সুতরাং জগৎকে একেবারে নাস্তির উপর বসান চলিল না। অথচ একদিক্ রাখ্‌তে গেলে অন্যদিক্ থাকে না। সুতরাং পর পর সৎ ও অসৎ বলিতে বলিতে ডিগ্‌বাজী খাইয়া চলিতে হইতেছে। এ বিপদ যে উপেন্দ্র বাবুর নিজের তা নয়। আচার্য্য শঙ্করকেই বাধ্য হইয়া মায়া সম্বন্ধে নানাস্থানে নানামত দিতে হইয়াছে। (ক) সৎ কি অসৎ তাহা নিরূপন করা যায় না (মুঃ ভাঃ ১।৪।৩; ২।১।১৪) (খ) ইহা নিত্য নিরুক্তা (নৃসিংহ উত্তর তাপনীয় ভাষ্য, ৯ম খণ্ড) (গ) সা চ মায়া ন বিদ্যতে (গৌরপাদীয় কারিকার ভাষ্য, ৬।৫৮) এই দুর্দ্দৈবের কারণ যা সকল Dogmatic Philosophyতেই ঘটিয়াছে। জ্ঞানের জন্য ব্রহ্ম ও জগৎ দুই-ই চাই। শঙ্কর পূর্ব্ব হইতেই এই দুইকে দুই স্বতন্ত্র কোটিতে স্থাপন করিলেন। এই দুইএর সামঞ্জস্য ছাড়া জ্ঞানতৃপ্ত হয় না। অথচ দুইটীকে দুই প্রকৃতি দিয়া ভাগ করা হইয়াছে—সামঞ্জস্য চলে না। তাই ধর পাকড়। ডেকার্টেরও তাই হইয়াছিল। হাঙ্গামার পর হাঙ্গামা আসিল, Spinoza এক করিলেন, কিন্তু কত খুঁৎ রহিয়া গেল। প্রাচীন Neo-platonistগণ এই ব্যবধান দূর করিবার জন্য Emanationএর পর Emanation বাহির করিলেন, ব্যবধান গেল না। স্ববিরোধের উপর স্ববিরোধই কেবল পুঞ্জীকৃত হইল। আমাদেরও বাসুদেব, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ, বাহির হইলেন, কিন্তু ব্যবধান ঘুঁচিয়াছে কি? উপেন্দ্র বাবুও হালে পানি না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশ ভাবে বসে পড়ে নাকে কাঁদিয়া দার্শনিক জগতের বালানাং ক্রন্দনং বলম্—বলেছেন, একটা অবোধ্য অনিবার্য্য মায়া না হ'লে কিছু বুঝা যায় না—সমন্বয় হয় না। খুব বুঝাতে এসেছেন কিন্তু! সমন্বয় কিসের? উপেন্দ্র বাবু না এই একটুখানি পূর্ব্বে 'নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ কি' এই প্রশ্নের সম্ভাবনাতেই হেসে একেবারে কুট্‌পাট্ হয়েছিলেন! তিনি না বলেছেন, এরূপ সম্বন্ধের প্রশ্ন "বন্ধ্যার পুত্রবত্তা" প্রভৃতির ন্যায় হাস্য জনক! তবে কোন্ মুখে বলিলেন 'ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা ও জগতের (ব্যবহারিক?) সত্তা স্বীকার করিলে এবং এতদুভয়ের সমন্বয় করিতে হইলে মানুষের বোধশক্তি মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য।" যেন মায়াবাদ ছাড়া জগতে আর দর্শন শাস্ত্র রচিত হয় নাই! কে বলিয়াছিল, আগে ব্রহ্মকে সৎ ও জগৎকে অসৎ বলিয়া আরম্ভ কর এবং পরে তাদের সামঞ্জস্যের জন্য একটা গোঁজামিল

খুঁজিয়া হয়রাণ হও—এ যে স্বখাত সলিলে ডুবে মরি, শ্যামা! সমন্বয় কি একটা সম্বন্ধ নয়, উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ সংস্থাপন ছাড়া কি সমন্বয় সম্ভব? তবে, যে সম্বন্ধের নামেই হেসে গড়াগড়ি, সেই সম্বন্ধের জন্য এখন এত দৌড়াদৌড়ি কেন? না হইলেই হবে না। এই ক থাণ্ডলি লিখিতে যাইয়া উপেন্দ্র বাবু নিশ্চয়ই মনে মনে খুব হেসে ছিলেন? কেন না, ইহার মধ্যে স্ববিরোধের একান্ত ভাব! ইহারই নাম দর্শনশাস্ত্র, ইহারই নাম ভারতীয় দর্শনতত্ত্বের মর্ম্মান্তিক পরিচয়। পরিচয় আছে কিন্তু আরও অনেকদূর পর্য্যন্ত দুই বস্তুর মধ্যে সমন্বয় করিতে হইলে সমন্বয়কারী তৃতীয় বস্তুর Tertium quid চাই যাহাকে উভয়ের গুণান্বিত হইতে হইবে, অথচ উভয়কেই অতিক্রম করিতে হইবে। 'এপার' 'ওপার'এর সমন্বয়কারী সেতুকে উভয় পারব্যাপীই হইতে হয়! সুতরাং মায়া সদসদাত্মিকা কেন তা নিতান্তই অবোধ্য নয়। ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে এক অনতিক্রমণীয় বাধা খাড়া করিয়া তাহার যখন নিদর্শন দরকার হইল তখন খৃষ্টীয় শাস্ত্র একাধারে দেবমানবধর্ম্মী পুত্রের কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সমন্বয়কারী যে দুইএর অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ তাহা আদিতে স্পষ্ট না হইলেও logical consequence রূপে পরে শ্রেষ্ঠ হইয়াই দাঁড়ায়। তাই, আজ যীশু ঈশ্বরকে স্থানচ্যুত করিয়া সৃষ্টির জগৎ জুড়িয়া বসিয়া আছেন। আমাদের দেশেও ত ঠিক তাহাই হইল! শঙ্কর শিষ্য সুরেশ্বর তৈত্তিরীয় বার্ত্তিকে বলিয়াছেন যাঁহাকে জানিলে সকল ভয় দূর হয় সেই ব্রহ্ম কিন্তু মায়ার ভয়ে ভীত (তৈঃ বাঃ, ২।৬৯—৭২) আর মায়াবাদী পৌরাণিক—তার হাতে মায়া নানারূপে নানা আকারে সকলের উপরে উঠিয়া বসিয়াছেন, মহাব্রহ্মও তার বাচ্চা। "ছিল হাতি হ'ল তুল কাট্‌তে কাট্‌তে নির্ম্মূল।" জগৎকে ছাঁটিয়া-ব্রহ্ম স্থাপন করিতে গেলে পরিণাম ফল ইহা ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না।

(২) শঙ্করের অদ্বৈত তত্ত্ব কি সত্য সত্যই এক কল্পিত abstract একত্ব? বহু হইতে এককে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহা সত্য সত্যই abstract এক। ও বহু আপেক্ষিক সত্য। বহুর ধারণাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিলে এক শূন্যে পরিণত হয়। উপেন্দ্র বাবু ত আমাকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি তাঁকে একটা প্রশ্ন করিতে পারি কি? তিনি কি 'নেতি নেতি' পথে 'বিষয় জগতের 'সর্ব্ব' নিঃশেষ করিয়া দেখিয়াছেন পরিণামে কি পাওয়া যায়? আমি তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, এ পথে যুগে যুগে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের পরিণাম যাহা হইয়াছে উপেন্দ্র বাবুরও তাহাই হইবে—পূর্ণচন্দ্র মিলিবে না,

মিলিবে অমাবস্যার অন্ধকার। এত জোর করিয়া বলিতেছি এই জন্য যে অজ্ঞাতসারে তিনি প্রতিপক্ষকে সাহায্য করিয়াছেন—আমি তাঁরই সায় পাইয়াছি। তিনি বলেন, তত্ত্বতঃ জগতের সত্তা নাই, ব্রহ্মই একমাত্র অনন্ত সর্ব্বব্যাপীসত্তা। জিজ্ঞাস্য এই জগতের যদি সত্তা না থাকে তবে জগৎব্যাপীর সত্তাটা থাকে কি ব্যাপিয়া? 'সর্ব্ব'র যে পথে গতি সর্ব্বব্যাপীকেও সেই পথে মহাপ্রস্থান করিতে হয়, নান্য পন্থা। সর্ব্ব যদি মিথ্যা হয় সর্ব্বব্যাপী সত্য হইবেন কোন লজিক্ অনুসারে। সকল abstract thinkingএরই পরিণতি এই, উপেন্দ্রবাবুর একার দোষ নয়। শঙ্করোত্তর মায়াবাদে মায়াবাদের যা logical consquence) 'সচ্চিদানন্দ' শূন্যে পরিণত হইয়াছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্য নাস্তিকতার অপবাদ দিয়াছেন। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া মায়াবাদের যে নিন্দা তাহা ভিত্তিহীন নহে। "Vision of the one in the many" ইহাতেই একের মূল্য। এই দৃষ্টিই জগৎ আজ সকল বিভাগে খুঁজিতেছে—শূন্যগর্ভ একের দৃষ্টি নহে। বহুকে 'নস্যাৎ' করিলে একের কোন মূল্য থাকে না—এক তখন হয় শূন্য। বহুকে অস্বীকার করিয়া উপেন্দ্রবাবু তাঁর একেকে শূন্যই করিয়াছেন। সন্ন্যাসীকে খাইবার জন্য ভক্ত একটী বাধাকপি দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী একটী একটী পাতা ফেলিয়া দিয়া 'নেতি' মার্গে কপি খুঁজিয়া হতাশ হইয়া বলিয়াছিলেন 'কপি মিলা নেই! মায়াবাদীও সন্ন্যাসী। বাস্তবিক, এই abstraction আমাদের জাতীয় অধঃপতনের মূল কারণ।

(৩) আমি বলিয়াছি মায়াবাদে জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের কোন সম্বন্ধ নাই। জগতের অস্ত কারণ "আছে কি না, এ প্রশ্ন আমার সঙ্গে বিচারে অপ্রাসঙ্গিক। যদিও আমার মতই তিনি পুনঃ পুনঃ সমর্থন করিয়াছেন তবুও শেষকালে যে আবার সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে বিভ্রাটের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

(৪) শঙ্করের মায়াবাদ কি অবোধ্য irrational? হাঁ কি না বিচার করিতে যাইয়া উপেন্দ্রবাবু নিজেই ত হাল ছাড়িয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি যেরূপ হতাশভাবে বলিয়াছেন "সমন্বয় করিতে হইলে মানুষের বোধশক্তি মায়াবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য" তাহার অর্থ কি এই নহে যে ওটা কিছু বুঝা যায় না তাই দিয়া আর কিছু বুঝাইতে যাওয়াটা কি খুবই Rational? যা নিজে সৎ কি অসৎ তাই বুঝা যায় না সেই Principle দিয়া জগৎ সৎ কি

অসৎ তাহার সত্তা বুঝাইতে যাওয়া কেবল Irrational তাহা নহে, আজগুবীও বটে! তাঁর এই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী যুক্তি বলে না বুঝাইয়াই বুঝাইয়া দেওয়া যায় না এমন তত্ত্ব কি আছে? আমি যদি বলি, ব্রহ্ম এক নির্ব্বিশেষ স্বগত-ভেদ-হীন সত্তা হইয়াও এই বহুত্বপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করিয়া আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাহাতে যদি কেহ আপত্তি করেন ইহাতে ব্রহ্মের একত্ব নষ্ট হইল। আমি বলি "অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তির অসাধ্য কি আছে?" "আপনার বেলায় মহাপ্রসাদ অন্যের বেলায় ভাত" বলিলে চলিবে কেন? নিজেই অনির্ব্বাচ্য নাম দিয়াছেন তার পর বলছেন অনির্ব্বাচ্য যখন তখন ত অবোধ্য বটেই। Question begging epithetটা একটা যুক্তি নয়! কে বলেছিল অনির্ব্বাচ্যা মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করতে? উপেন্দ্রবাবু বলেন, মানুষের বোধ শক্তি ঐ রকমই করে! জিজ্ঞাসা করি, এই বহুনিন্দিত মানববুদ্ধি ছাড়া আর কোন বুদ্ধি ধার মিলে কি যাহা দিয়া দর্শনশাস্ত্র গড়িতে হইবে? মুনি ঋষি হইতে চুণাপুঁঠি আমরা পর্য্যন্ত সকলকেই এই দুর্বৃত্ত বোধশক্তিটার উপরই নির্ভর করিতে হয়। মানববুদ্ধির নিন্দা "যে ডালে বাসা সেই ডাল কাটার" লজিক্। শেষে যদিও তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন অবোধ্য বলিতে চাও আপত্তি নাই কিন্তু কোট বজায় রাখিবার জন্য সমাধান করিলেন অতএব মায়াবাদ irrational নয়! কি যুক্তি বলে? "জুতা মেরেছে মেরেছে কিন্তু অপমান ত করে নাই" ইতি ন্যায়াৎ বোধ হয়।

(৫) সাধন ভজন দ্বারা কি সত্য সত্যই জীব ব্রহ্মের এক-স্বরূপত্ব অপ্রমাণিত হয়? আমি বলিয়াছি, মানুষ যখন কিছু ছাড়িতেছে, সাধন ভজন করিতেছে—তখন কিরূপে বলিবে যে সে ব্রহ্ম। যে ব্রহ্ম জানে সেই ব্রহ্ম এই ত যুক্তি? যখন জানে নাই, জানিবার জন্য প্রয়াস করিতেছে মাত্র—তার এই সাধন ভজন কি প্রমাণ করিতেছে না যে সে ব্রহ্ম নয়? আমার এই মহাপাপের জন্য আমার ঘাড়ে উপনিষদের ঋষিদিগকে চাপাইয়া দিয়া আমাকে নরকে পাঠাইবার চেষ্টা হইয়াছে। জান না "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ" ইহা ঋষিবাক্য? অবিদ্যার দাস, তুমি তা জানবে কি করে? ও হরি! আমি কখন বল্লাম ত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না? আমি না বলেছি যে ত্যাগ করে সে ব্রহ্ম নয়। উপেনবাবু গড়েছেন এক tremendous ignoratio elenchi. "এখান থেকে মারলাম ছুরি লাগল কলাগাছে, হাটু বেয়ে রক্ত পড়ে চোখ গেল রে বাপ"! মনে পড়ছে এইরূপ এক বিপত্তির

সম্মুখীন হইয়াই আচার্য্যশঙ্কর বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"অহোহনুমান কৌশলং দর্শিতমপুচ্ছশৃঙ্গেস্তার্ত্তিকবলীবর্দ্দৈঃ"।

আগেও ব্রহ্ম পরেও ব্রহ্ম মাঝখানে মায়ার স্বপ্ন, এটা যে আমার স্বকপোল কল্পিত নয় তা উপেন্দ্র বাবু নিজেই নানা শাস্ত্র হতে প্রমাণ করে দিয়েছেন। যুক্তিও যে কম দিয়েছেন তা নয়। আচার্য্যশঙ্কর ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" এই কঠশ্রুতির ভাষ্যে আরম্ভ করিয়াছেন ব্রহ্ম লইয়াই। কিন্তু সংসার বৃক্ষটা যার আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত অতি সুন্দর কবিত্ব বর্ণনা আছে তাহা অবিদ্যা বীজ প্রভব। বিদ্যার আবির্ভাবে বাজীকরের বাজীর ন্যায় মিলাইয়া যায়। পরে যদি শূন্য না থাকে তবে ব্রহ্ম ছাড়া আর কি থাকিবে? লাভ ক্ষতি কার কিছু নয়। মায়াবাদী বলিবেন, জীবের মুক্তি। মুক্তি ত হয় বিদ্যার আবির্ভাবে। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কাছে বিদ্যা আসিবে না—পরমাত্মাপি সংসারমায়া ন সংস্পৃশ্যতে। অবিদ্যা দ্বারাও বিদ্যা লাভ হয় না। উপেন্দ্র বাবু বলেন শ্রুতিবাকের শ্রবণ মনন কর। পূর্ব্বোক্ত কঠভাষ্যে আচার্য্যশঙ্কর বলিয়া রাখিয়াছেন, শ্রুতিও ঐ সংসার বৃক্ষের পত্র—শ্রুতি স্মৃতি ন্যায় বিদ্যোপদেশ পলাশঃ—সুতরাং অবিদ্যার ফল। মায়াবাদের দিক্ হইতে সে পত্র চর্ব্বণে কি ফল হইবে? দাঁড়াইতেছে, যে মুক্ত নয় তার আর মুক্তির সম্ভাবনা নাই। উপেন্দ্র ধীরেন্দ্রই যে কেবল অবিদ্যার দাস তাহা নহে, উপনিষদের ঋষিরাও সুতরাং অবিদ্যার উপরে নহেন। উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট উভয়েই অবিদ্যার অধিকারে। অবিদ্যা অতিক্রম না করিলে অবিদ্যাকে অবিদ্যা বলিয়া জানিবার উপায় নাই। অতিক্রম করিলে ত নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত-ব্রহ্ম—যেখানে বিদ্যা অবিদ্যার ভেদ নাই। সেখান হইতেও কোন উপদেশ আসিবে না, সুতরাং যেখানে আছেন সেইখানেই থাকুন। বুঝিলেন উপেন্দ্র বাবু, a Consistent Mayavad must be speechless!

এখন উপেন্দ্র বাবুর চিন্তার ধারার একটু পরিচয় দিয়া উপসংহার করি। একস্থানে বলিয়াছেন সুখদুঃখাদি দেহ ধর্ম্ম অসৎ অমার্জ্জিত বুদ্ধি স্থূলদর্শীরাই দেহ ধর্ম্ম সুখদুঃখাদিকে সত্য বলিয়া জানে। কিন্তু শেষ করিয়াছেন, "মায়াকে অলীক বলিয়া আমরা যতই পরিহাস করি না কেন তাহার দুঃখদায়িনী শক্তি কি নিদারুণভাবে সত্য তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন।" মায়াকে অলীক তিনিই বলিয়াছেন, আবার সে জন্য

আক্ষেপও তিনিই করিতেছেন। সুখ দুঃখকে তিনিই উড়াইয়া দিয়াছিলেন, আবার তিনিই তাহা সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। ইহাকেই abnormal Psychologyওয়ালারা বলেন Mental Dissociations. উপেন্দ্র বাবু কার উপর গোসা করে এ নিদারুণ সত্যটা একেবারে বাইরে নিয়ে এলেন? আশা করি ইহা আধুনিক জড়বাদের সুরসাল ফল ভক্ষণ হেতু বদহজমির উদ্গার নহে। আর বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন নাই, পাছে Psychopathology আসিয়া পড়ে। অতদূর যাব না। যদি উপেন্দ্র বাবু অনুগ্রহ করেন—সুখিনঃ ক্ষত্রিয়া পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্—তবে আবার পাঠকের সঙ্গে আসিয়া দেখা করিব। এখন বিদায়।

বিচারক

[শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী]

(১)

আমি যদি মা হ'তাম মা,
তুমি যদি ছেলে,
খুঁজে সারা হ'তাম না মা,
বাইরে তুমি গেলে।
ধুলো ঝেড়ে মুছিয়ে নিয়ে
জামা কাপড় পরিয়ে দিয়ে,
অমন ক'রে দুধ গিলিয়ে
দিতাম নাক ঠেলে,
আমি যদি মা হ'তাম মা,
তুমি যদি ছেলে।

(২)

তুমি যদি খেলতে যেতে
ধুলো-বালির ঘরে,
মালুই, সরা, চিত্তের পাতা
এনে দিতাম করে।

বিষ্টি ধরে কচুর পাতায়
আন্‌তে দিতাম ভিজে মাথায়,
উঠতে দিতাম গাছের শাখায়
খেলার খাবার তরে,
তুমি যদি খেলতে যেতে
ধুলো বালির ঘরে।

(৩)

দুপুর বেলা খেল্‌তে যদি
রোদের মাঝে গিয়ে,
যেতাম না মা আন্‌তে টেনে
কোলের মাঝে নিয়ে।
চুমো খেয়ে হাত বুলায়ে
দিতাম না'ক তোমার গায়ে
দিতাম না ঘুম তোমার কায়ে
ঘুমপাড়ানী দিয়ে,
দুপুর বেলা খেল্‌তে যদি
রোদের মাঝে গিয়ে।

(৪)

তুমি যদি থাক্‌তে প'ড়ে
একটু অসুখ ক'রে
কেঁদে সারা হ'তাম না মা,
তুলসী-তলায় প'ড়ে।
হ'ত নাক মানত করি
সাধাসাধি ওষুধ ধরি
ব'লে দিতাম,—পালাও হরি,
আমি খোকায় ধ'রে,
তুমি যদি থাক্‌তে প'ড়ে
একটু অসুখ ক'রে।

সুখের ঘর গড়া

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

দয়াময়ীর বাজারে পৌছিলে ভবানীর পাল্কী নামানো হইল। এইখানে সহযাত্রী বন্ধুদের সহিত মিলিত হইবার কথা কিন্তু এখানে আসিয়া ভবানী শুনিলেন বাজারের লোকেদের মধ্যে কলেরা দেখা দিয়াছে। দুই চারিজন ইতিমধ্যে মারাও গিয়াছে। এই বাজারের মালিক ভবানীপ্রসাদের খুড়া; একজন কর্ম্মচারী এখানে তোলা (টোল্) আদায় করিবার জন্য মোতায়েন থাকিত। তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভবানী শুনিলেন যে সে ব্যাচারীও ঐ রোগে আক্রান্ত। শুনিয়া ভবানী বড় কাতর হইলেন। বিশ্রাম করা বন্ধ রাখিয়া তাহাকে দেখিতে চলিলেন; বেহারাদের ডাক দিলেন।

সভয়ে বলিল "না হুজুর রোগ বড় খারাপ গিয়ে কাজনি—আপনি বাড়ী যান আমি না হয় খোঁজ নিয়ে যাচ্ছি"। ভবানী বলিলেন তোমার প্রাণের ভয় হয় তুমি থাক আমার কাজে কথায় প্রতিবাদ করনা—"

আর কোন কথা না বলিয়া প্রভুর পশ্চাতে পশ্চাতে গেল।

পূর্ব্বকথানুসারে বিজয় ও পঞ্চু দয়াময়ীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভবানীকে তথায় দেখিতে না পাইয়া উভয়ে ভাবিল হয় ভবানী চলিয়া গিয়াছে না হয় আসিয়া পৌছে নাই। ঘাটের দোকানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল এক বাবু পাল্কী চাপিয়া উত্তর মুখে গিয়াছে। সিদ্ধান্ত করিল পায়ের যন্ত্রণা বশতঃ ভবানী বোধ হয় অপেক্ষা করিতে না পারিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। উভয়ে আর অপেক্ষা না করিয়া—গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিল।

বিজয়দের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যে পথ সেই পথ দিয়া আরো আধপোয়া আন্দাজ রাস্তা দূরে তর্কসিদ্ধান্তের বাটী। বাড়ীর কাছে আসিয়া বিজয় পঞ্চুকে বলিল—"আমাদের এখানে একটু বসে জিরিয়ে তারপর বাড়ী গেলে হয় না?" পঞ্চু এটিকেট অনুমোদিত মিথ্যা বিনয় বা কৃত্রিম ওজর এ সবের বড় ধার ধারিত না; সঙ্গে সঙ্গে সহর্ষে বলিল "সেটা আর এত অসম্ভব কি? বেশতো চলুন।" উভয়ে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে উঠিল। তখন বেলা এগারটা। রৌদ্রের তেজ খুব প্রখর। বিজয় পঞ্চুকে বসাইবার জন্য একটা আসন আনিতে বাড়ীতে ঢুকিল।

বিজয় মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া পঞ্চুর কথা বলিল— মা বলিলেন "তর্ক-সিদ্ধান্তের ভাগ্নে? তা বাইরে বসালি কেন? ঘরে নিয়ে আয় না?" বিজয় বাহিরে গেল। যজ্ঞেশ্বরী ছেলে ও বন্ধুর জন্যে জল খাবার সাজাইতে বসিলেন। কিরণ মাকে সাহায্য করিতে গেল। নলিনী ও তরু কলিকাতা হইতে আনিত দ্রব্যাদি দেখিতে লাগিয়া গেল। খানিক পরে নলিনী আসিয়া বিজয়কে চুপি চুপি বলিল "পঞ্চু দাদাকে নিয়ে এস বাড়ীর ভিতরে।" পঞ্চু বলিল "মাপ করবেন বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাবেন না—যা হয় এখানেই আনুন—মেয়েদের মধ্যে বসে আড়ষ্ট হয়ে চক্ষুলজ্জা বাঁচিয়ে জলযোগ করা—মাপ্ করবেন মশাই উৎকণ্ঠার সময় ঘাব্‌ড়ে যাব—এখানেই আনুন—"। বিজয় দ্বিরুক্তি না করিয়া নলিনীকে বলিল "তোতে আর তরুতে দুজনের জলখাবার নিয়ে আয় আমরা যাব না—"।

তরু নলিনী জলখাবার আনিয়া ধরিয়া দিল। কিন্তু যাকে বলে "যায়গা করে জলখাবার দেওয়া" তা হইল না দেখিয়া বিজয় দুইবোনকে ডাকিয়া বলিলেন "বোকা মেয়েরা এই বুঝি গেরস্থ বিদ্যে শেখা হচ্চে, যায়গা না করে খাবার ধরে দিলি যে? আচ্ছা, বুদ্ধি! যা নলি আসন আন্‌গে" বলিতে বলিতে বিজয় নিজেও ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর গেল; তরুকে বলিয়া গেল দাঁড়া হাতে করে; মাটীতে নামাসনি, আসছি—"।

একে অপরিচিত যুবা, তাতে আবার দাদার বন্ধু, তার উপর একা তৃতীয় ব্যক্তিও কেহ নাই, দাদার আদেশ যতক্ষণ না সে আসে তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে; তরু লজ্জায় কাট হইয়া গেল; বেচারী পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া মুহূর্ত্তকে যুগের মাপে মাপিতে লাগিল। পাথরের মূর্ত্তির একটা রক্ষা, তা লজ্জায় লাল হয় না আর ঘামেনা; তরু কিন্তু লজ্জায় রাঙ্গিতে ও ঘামে ভিজিতে লাগিল। পঞ্চু ব্যাটা ছেলে, সদা সপ্রতিভ; তার উপর বয়স দোষ যাকে বলে রোম্যানটিক্ সে তরুর দিকে সভ্যভাবে তাকাইয়া এক নজর দেখিয়া লইল; দেখিল খাসা সুগঠনা একটি সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু ভারি শঙ্কটেই পড়িয়াছে ব্যাচারী। পঞ্চু স্বভাবতঃই রহস্য প্রিয়; তরুর এই কঠিন অবস্থার কমিক্ দিকটা তার নজরে পড়িল; শুইয়াছিল উঠিয়া হাসি চাপিয়া বলিল "দাদাতো তোমাকে ভারি মুস্কিলে ফেলে গেছে দেখছি রাখ তুমি ওইখানে নামিয়ে, আচ্ছা শাস্তিতো বটে!" এমনি ভাবে সম্বোধিত হইয়া তরু চমকাইয়া অনিচ্ছা স্বত্বে একবার পঞ্চুর দিকে চাহিয়া তখনি চোখ ফিরাইয়া লইল; পঞ্চুর সমবেদনার উক্তির ফলে তরু আরও লাল হইয়া উঠিল,আর নাকের ডগা ও চোখের কোল আরো ঘামিয়া উঠিল।

সে একবার দাদার পথের দিকে তাকাইল। পর মুহূর্ত্তেই নলিনী একটা আসন আনিয়া সেইখানে পাতিয়া দিল; নলিনী পাড়াগেঁয়ে মেয়ে; পঞ্চুকে সে চেনে, এবং পঞ্চুদা বলিয়া ডাকে, তার সম্মুখে তরুকে তদবস্থায় দেখিয়া সেও হাসিয়া বলিল 'কিলো এখনো ধরে দাঁড়িয়ে আছিস্?'

পঞ্চু হাসিয়া বলিল—"বা ধরে থাক্‌বে না তো কি? ছেড়ে দেবে? তা হলে যে সব পড়ে যাবে রে—"। পাথরের তরু সত্যিই তো পাথরের নয়,—সরস উত্তর শুনিয়া সে ফিক্ করিয়া, হাসিয়া জল খাবার নামাইয়া দিয়াই ছুটিয়া পলাইয়া একেবারে পড়বি তো পড় দিদির ঘাড়ে! কিরণ চমকাইয়া গিয়া বলিল "কিলো হল কি? জুজু নাকি?" "দুর্—যাও—জানিনি" বলিয়া একেবারে ঘরে ঢুকিয়া চুপ করিয়া বসিল। পঞ্চু বিজয়ের বিলম্ব দেখিয়া জিজ্ঞাসিল 'হ্যাঁ নলি তোর দাদা কোথা?'

ন। দাদা ডাব কাট্‌ছে।

প। ও মেয়েটী বিজয় বাবুর বোন্? ও কে তো দেখিনি? নাম কি?

ন। হ্যাঁ,-ওর নাম তরু-এই তো ছয় সাত মাস হলো ওরা এসেছে। বিজয় মুখ কাটা দুটা ডাব লইয়া আসিয়া উপস্থিত। দেরী হয়ে গেছে বলিয়া পঞ্চুকে ডাব একটা আগাইয়া দিল।

এমন সময় বাহিরে রাস্তার উপর পাল্কী বেহারার শব্দ হইল। নলিনী পাল্কী বেহারার শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে গেল; কাদের বউ বা বর একটা কিছু আসিতেছে এই সে ভাবিয়া ছিল। তরুকেও একটা জোরে ডাক দিল "তরিদি বউ দেখবি আয়—" তরু বাহিরে দরজা দিয়া ছুটিয়া আসিল। দুই বোনে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে বউ দেখিবার আশায় দাঁড়াইয়া রহিল। পঞ্চু বলিল "বোধ হয় ভবানী আসছে—" সম্ভব ভাবিয়া বিজয় বাহিরে গেল। সত্যই ভবানী। পাল্কীর ভিতর হইতে বিজয়কে দেখিয়া ভবানী পাল্কী থামাইয়া নামিয়া পড়িল। দুই ভগ্নীতে বউ বা বরের কোনটার একটাও নয় দেখিয়া, হতাশ হইল। ভাবে বুঝিল দাদারই আর একজন বন্ধু। তরু নলীর হাত ধরিয়া টানিয়া অন্দর অভিমুখে চলিয়া গেল। নলিনীর কৌতূহল বেশী, সে নবাগতকে চিনিল। জমিদারের ভাইপো তাদের বাড়ী আসিয়াছে দেখিয়া নলিনী একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কারণ সেটা যে একেবারেই অসম্ভব ঘটনা।

নলিনীর বিস্ময় ও সম্ভ্রম পূর্ণ অপলক চাহনি দেখিয়া তরু ভাবিল নবাগত

কেউ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হবেন, সে নলিনীর কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিল—'উনি কে নলি?'

ন। তোর বর তরি দি—!

তরু। যা তুই ভারি অসভ্য—

ন। আচ্ছা না, না, তোর নয় আমার—

তরু। (হাসিয়া) বটে! দাঁড়া দিদিকে কাকীমাকে বলছি—

ন। না ভাই বলিস্‌নি তোকেই দেবো!

তরু। যাঃ তোরা ভারি অসভ্য-পাড়া গেঁয়ে কি না—

ন। (হাসিয়া) সহুরেরা বুঝি জলখাবার দিতে গিয়ে বর যোগাড় করে—

তরু। (সভয়ে) না ভাই তুমি বড় অসভ্য, ছিঃ, দাঁড়াও দিদিকে বল্‌ছি—

ন। না ভাই না ভাই! তা হলে আ-আ-আড়ি—"

বিজয় ডাকিল 'নলি' 'তরু'। ডাক শুনিয়া দুই বোনে ছুটিয়া বাহির দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিল। বৈটকখানার ঘরের কাছে আসিয়া নলিনী বলিল "কেন দাদা?—" "আর একটা আসন নিয়ে আয়—"। নলিনী চলিয়া গেল।

ভবানীকে বিজয় হাত ধরিয়া বসাইতে গেল।

ভ। ছোঁবেন না আমাকে?

বি। কেন?

প। অস্পৃশ্য হলে কি করে হে?

ভ। কলেরা রুগী ছুঁয়ে আসছি—

উভয়ে। সে কি? কোথা?

ভবানী সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। বিজয় শুনিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। আর জেদ না করিয়া বলিল 'তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ডাবটা খান?'

ভ। না এখন খাওয়াই উচিত নয়—স্নান করে কাপড় ছেড়ে তবে ওসব—

প। পায়ের ব্যথাটা কেমন?

ভ। তেমনি; কমেছে একটু—আসি তবে বিজয় বাবু—এখন আলাপ হয়েছে রোজ আস্‌বো।

বি। আমিই যাব; আপনাকে আস্‌তে হবে কেন?

প। (বিজয়কে) কেন মশাই? জমিদারের শ্রীচরণ কি হাঁটে না?

বিজয় অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"না—না তার জন্যে নয়—"তবে—"

প। তবে কিনা শ্রীচরণ এখন ব্যথা পীড়িত।

তিনজনেই হাসিল। ভবানী বিলম্ব না করিয়া পাল্কীতে গিয়া উঠিবে এমন সময় বিজয় বলিল একটা অনুরোধ আছে রাখবেন?

ভ। কি শুনি না এত সকাতর নিবেদন কেন?

বি। দু জনকেই এ অনুরোধ।

প। ব্যাপার তাহলে গুরুতর! কি মশাই?

বি। কাল মধ্যাহ্নে আপনাদের দুজনের গরীবের বাড়ীতে নেমন্তন্ন; আমার খুড়তুতো বোনের ভাত কাল—

প। বেশতো অতি উত্তম! ব্রাহ্মণ বটু ফলারের নেমন্তন্ন পেলে স্বর্গের লোভ ছাড়তে পারে—

ভ। বেশতো ভালইতো আজ খেতে পারলাম না, কাল এসে খাবো—

এই বলিয়া ভবানী যাত্রা করিল। পঞ্চুও জলখাওয়া শেষ করিয়া উঠিল। বন্ধুদের বিদায় করিয়া দিয়া বিজয় বাড়ীর ভিতর মায়ের কাছে গিয়া বলিল—

বি। মা তোমাকে আর কাকাকে না বলে একটা কাজ করেছি—

মা। কি করেছ?

বি। জমীদারের ভাইপো ভবানী বাবু আর সিদ্ধান্ত মশাইএর ভাগ্নে পঞ্চু বাবুকে কাল খেতে নেমন্তন্ন করিছি।

মা। তাই ভাল! তা বেশ করেছ এর জন্য আর এত কাতরতা কেন? তা জমীদারের ছেলে এ বাড়ী আসবে?

বি। কেন? তিনি তেমন লোক নন্। ভারি অমায়িক নিরহঙ্কার—

মা। তার জন্যে নয়—

বি। তবে—

মা। পরে সব কথা বলবো এখন নেয়ে খাবি দাবি চল্।

বিজয় স্নানাহার করিয়া মা কাকী ও ভগিনীদের সহিত আলাপ করিতে বসিল কথোপকথনের ছলে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া একটু যেন দমিয়া গিয়া বলিল—"আমি যে আবার ওই জমীদারেরই ভাইপোকে নেমন্তন্ন করলাম?" কিরণ বলিল—"তিনিওতো জানেন না ব্যাপার সব, বাড়ীতে নিশ্চয়ই শুনতে পাবেন শুনলে হয়তো আর আস্‌বেন না—"। বিজয়ের মা বলিল,—"না আসবার তো কারণ দেখিনি, এতো বন্ধুতে বন্ধুতে মিতালীর নেমন্তন্ন, সামাজিক নয়!" সদু বলিল।—"তা হলেও সামাজিকের দিনে তো—তবে একটা কথা দিদি শুনিছি ছেলেটা মানুষ নাকি বড় ভাল—জমীদারের ভাইপো, ওই পর্য্যন্ত

কোনো হাঙ্গাম হুর্জ্জুতে নেই, খাসা ছেলে! কতলোক এই দলাদলিতে তাকে জড়াতে চেয়েছে, কিন্তু গাঁয় একটা কিছু গোল বেঁধেছেতো অমনি কলকাতা চলে যায়—"। বিজয় বলিল আমিও এই এক আধ ঘণ্টার আলাপে যা পরিচয় পেয়েছি তাতে মনে হয় এ ভদ্রলোকের হাতে যখন জমীদারী পড়বে তখন গাঁয়ের ভাগ্যি বদ্‌লে যাবে—"। সহু চাপা স্বরে বলিল—"যদি পড়ে।" সকলেই কথা শুনিয়া উৎসুক নেত্রে সহুর মুখের দিকে তাকাইল—সহু বুঝিল এ সব কথার উল্লেখ করাটা ভাল হয় নাই। সে আর কোন কথা কহিল না। বিজয় জেদ ধরিল শুনিবে। যজ্ঞেশ্বরী বুঝিলেন সহু কোন কারণে সে কথার আলোচনা পছন্দ করেনা, কাজেই বুদ্ধি করিয়া কথা ঘুরাইয়া দিলেন। বলিলেন "তুই এসেছিস্ বাবা, একটু যেন ভরসা পেলাম; কাজটায় হাত দিয়ে অবধি আথান্তরে পড়িছি তোমার কাকার্তো ভয়েই সারা, গাঁয়ের জমীদার দল যদি তাঁকে এক ঘরে করে—শুনছি বাউনরা নাকি জোট বেঁধেছে খেতে আসবেনা।" বিজয় দমিয়া গিয়া বলিল "তুমিই কেন এ ঝন্‌ঝাট্ বাঁধাতে গেলে মা—"। মা বলিল "ঝন্‌ঝাট আবার কি? আমি আমার দেওরঝির ভাত দিচ্ছি, বাউন খাওয়াচ্ছি কে করে না তা?" বিজয় বলিল—"মেয়েছেলের আবার ভাত কেন?" বলিয়া হাসিয়া খুড়ীর দিকে তাকাইল খুড়ীর মনের ভাব বুঝিতে। খুড়ী বলিল "সত্যি বাবা দিদির সব আলাদা কাণ্ড"। যজ্ঞেশ্বরী কৃত্রিম কোপে বলিলেন "কেন গা ছেলে? মেয়ে ছেলে ছেলে নয় না?তোরাই কুলের প্রদীপ ওরা বুঝি—"বিজয় বলিল "মহাজন মা মহাজন ওই দেখনা দুটী মহাজন মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছেন" বলিয়া নলিনী ও তরুর দিকে সহাস্যে তাকাইল। যজ্ঞেশ্বরী দুই কন্যার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমু খাইয়া বলিলেন "হোক্! তোর কি? তোরও যখন মহাজন আস্‌বে ঘরে তখন দেখবি মহাজনের মূল্য কত!" মা জ্যাঠাইমার স্নেহসিক্ত আদরে দুই বোন মুখ টিপিয়া হাসিল।

কথা বার্ত্তা শেষ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিজয় বাড়ীর বাহির হইবে এমন সময় পঞ্চু আসিয়া তাহাকে ডাক দিল উভয় বন্ধুতে তখন সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইল। মতলব ছিল ভবানীপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করা। পথে বিজয়ের মুখে পঞ্চুও সব কথা শুনিয়া বলিল "তাতে কি? গ্রামের ও নিত্যক্রিয়া এতে করে আমাদের বন্ধু সম্মিলনে কোন বাধা নাই"। বিজয় ভরসা পাইয়া নিশ্চিন্ত হইল। উভয়ে তখন জমীদার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অন্নপ্রাশনের পূর্ব্বরাত্রিতে যজ্ঞেশ্বরীর চিত্ত একটা অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিল। একটা সামান্য সাধারণ অথচ বড় সাধের গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা যে অকারণে এমন অশান্তির হেতু হইয়া উঠিবে যজ্ঞেশ্বরী তা ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না। কোথা হইতে তুচ্ছ একটা খুঁৎ ধরিয়া গ্রামের মাতব্বর মুরুব্বীরা যে তাঁর সহিত শত্রুতা আচরণ করিতে বসিল, এবং কেনই বা বসিল, এর নিগুঢ় মর্ম্ম যজ্ঞেশ্বরীর মনে ও সহজ সরল বুদ্ধিতে ধরা পড়িল না। হাজার হউক মেয়ে মানুষ, গৃহস্থ বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে; তাহাদের পরম বল বাড়ীর পুরুষরা; যজ্ঞেশ্বরী তাঁহার ভীরু দুর্ব্বলহৃদয় দেবরটির নিকট সে সাহায্যের ভরসা করিতে পারিলেন না; তার উপর কথার বলে খুব হুঁসিয়ার হইয়া চলা সত্ত্বেও খোঁড়ার পা খানাতে পড়ে; যজ্ঞেশ্বরী গ্রামের হালচাল জানিয়া খুবই সাবধানে চলিতেছিলেন তবু এই এক আসন্ন বিভ্রাট! সেদিন অপরাহ্ণে তর্কসিদ্ধান্তের নিকট আন্তরিক উৎসাহ ও আশ্বাস পাইয়া তবু কতকটা তাঁর ভরসা জাগিয়াছিল। কেবল একটা কথাই তাহাকে বেঁধা কাঁটার মত অস্বস্তি দিতে লাগিল—সে হইতেছে দেবরের সপরিবারে গৃহত্যাগ কল্পনা। কুচক্রীর কুচক্রে পড়িয়া এই নিরূপদ্রব দেবর গো-বেচারাটি গার্হস্থ্য অশান্তিতে পড়িবে এই তার বিষম ভাবনা অথচ কার্য্যে এতদূর অগ্রসর হইয়াও তাহার অনুরোধ সত্ত্বেও উৎসব বন্ধ করা যায় না। সাত পাঁচ ভাবিয়া এবং রাত পোহাইলে শুভকাজটি নির্ব্বিবাদে যাতে সমাধা হয় ঠাকুরের কাছে এই নিবেদন জানাইয়া যজ্ঞেশ্বরী চোখ বুজিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি পরম উৎসাহে কাজ আরম্ভ করিলেন। সখের অন্নপ্রাশন হইলেও হিন্দুর নৈমিত্তিক ক্রিয়ার সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান এমন ভাবে জড়িত যে কোনোনা কোনো ভাবে দেবার্চ্চনা না করিলে কোন সংস্কার ক্রিয়াই বিধিবিহিত হয় না। অন্নপ্রাশনের পূর্ব্বে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ নামে একটা ধর্ম্মানুষ্ঠান হিন্দুমাত্রকেই করিতে হয়। এ বাড়ীর কুলপুরোহিত মাণিক চাটুয্যে। এজন্য তাহাকে সময়ে খবর দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু যে কারণেই হউক মাণিকরাম যজমান বাড়ীতে যথা সময়ে উপস্থিত হইল না দেখিয়া যজ্ঞেশ্বরী বড় ভাবিত হইলেন। এদিকে বেলা বাড়িয়া চলিল; খুকীর মুখে ভাত না দিলে ব্রাহ্মণ ভোজনের পর্ব্ব আরম্ভ হইবে না। ব্রাহ্মণরা আসিবে না বলিয়া ভয় দেখাইলেও দু চার জনও যদি আসে এবং

ফলার ভোজনে বিলম্ব দেখিয়া গোলমাল বাঁধায় এই ভয়ে যজ্ঞেশ্বরী বিজয়কে ডাকিয়া বলিলেন "বাবা বিজু, বাউন তো এল না, একবার দেখ্‌না চাটুয্যে মশাইকে—যদি তিনি বাড়ী না থাকেন তবে সিদ্ধান্ত মশাইয়ের কাছে গিয়ে একটা বিহিত করে আয়—"। বিজয় বিলম্ব না করিয়া বরাবর তর্কসিদ্ধান্তের বাড়ী আগেই গেল ; পথে খুড়ার সঙ্গে দেখা হইল ; ভোলানাথ শুনিল বিজয় পুরোহিতের সন্ধানে যাইতেছে। সে বলিল—"এইমাত্র মাণিক দা'র সঙ্গে দেখা হল, সে জমীদার বাড়ী কি কাজে গেল ; বল্লে ঘণ্টা দুই দেরী হবে—"। বিজয় চটিয়া গিয়া বলিল—"দু ঘণ্টা অপেক্ষা মানুষ করতে পারে ? খুকীটার যে পিত্তি বেরিয়ে যাবে ? তার পেটে একটু দুধ পড়েনি শুধু মাই খেয়ে আছে—মা কাকীমার যেমন কীর্ত্তি কচি ছেলের ওপর ধর্ম্ম ফলাচ্ছেন্ ! আমি সিদ্ধান্ত মশাইকে ডেকে আনিগে।" পুরুতকে পুরুতের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া গোলমালকে আরো জটীলতর ভাবে পাকাইয়া তোলার যে সম্ভাবনা বেশী তা ভোলানাথ বুঝিল ও ভাইপোকে বুঝাইল। বিজয় কোন কেয়ার না করিয়া চলিয়া গেল। ভোলানাথ ভাজ ও ভাইপোর এইসব একগুঁয়েপনায় মনে মনে বিরক্ত হইয়া "যা ইচ্ছে করগে সব" বলিয়া বিরক্তভাবে বাড়ী ফিরিল।

সিদ্ধান্ত মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া বিজয় কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কেবল পাশের কুটীরী হইতে একটী কিশোরী কোমলকণ্ঠনিঃসৃত সংস্কৃত শিবস্তোত্রধ্বনি শুনিল। বিশুদ্ধ উচ্চারণের ছন্দ বোধে এবং ললিত কণ্ঠের মাধুর্য্যে বিজয় মোহিত হইয়া স্থিরভাবে শুনিতে লাগিল। হঠাৎ ছন্দ কাটিয়া গেল, সঙ্গে একটা পরিচিত যুবা-পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল। শেষোক্ত কণ্ঠস্বর বালিকার উচ্চারণ শুধরাইয়া দিতেছে—"ম—হেশ মীশ—" ইত্যাদি বালিকাও তদনুকরণে হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রায় পুনরুচ্চারণ করিল—।

বিজয় তখন ভরসা পাইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া বলিল—"পঞ্চু বাবু আছেন।" পঞ্চু ও উমা দুজনেই থামিয়া গেল। পঞ্চু বিজয়ের কণ্ঠ চিনিয়া আগাইয়া আসিল—উমা—পালাইতে উদ্যত। পঞ্চু তাহাকে থাম্ যাস্‌নি বলিয়া নিরস্ত করিয়া বিজয়কে সম্বর্দ্ধনা করিল—"পঞ্চু বাবু নেই কেহ পঞ্চু তট্‌চাজ্জি আছেন বটে—তার পর অসময়ে কি মনে করে বন্ধু ?" বিজয় ঘরে ঢুকিল। উমা অপরিচিত যুবাকে দেখিয়া পলাইতে উদ্যত পঞ্চু ডাকিয়া বলিল—'যাচ্ছিস্ যে অসভ্য মেয়ে।'

তিরস্কার শুনিয়া সে সভয়ে সলজ্জ চাহনি মাটীতে বদ্ধ করিয়া নযৌ ন তস্থৌ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিজয় হাসিয়া বলিল—"কি হচ্চিল ? ওই বোন নাকি ?

পঞ্চু। মাষ্টারী মশাই মাষ্টারী—সে দিন একটা শিবস্তোত্র শিখিয়ে গেছি আজ তাকে ভুলে পুড়িয়ে খেয়ে বসে আছে—যিশুভজার স্কুলে পড়ে এই হয়েছে। অপরিচিত যুবাপুরুষের কাছে নিজের অকর্ম্মণ্যতার নিন্দাঘটিত তিরস্কারে উমা যেন নিবিয়া গেল। লজ্জায় তার অলক্তাভ কপোল ও কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল—সে ঘামিতে লাগিল।

বিজয়। কেন মশাই নিন্দে করছেন—যতটুকু আবৃত্তি শুনিছি তা অতি চমৎকার লাগ্‌লো, আমি এমন মধুর কণ্ঠ আর উচ্চারণ শুদ্ধ মেয়েছেলের মুখে শুনিনি—তা সত্য বল্‌ছি।

যে অপরিচিত এমন করিয়া প্রশংসা করে এত অকৃত্রিম আবেগে, তাকে প্রশংসিত ব্যক্তি না দেখিয়া থাকিতে পারে না—প্রশংসাকারী যদি অজানা সুদর্শন যুবাপুরুষ হয় আর প্রশংসিত যদি কুমারী কিশোরী হয় তবুও না। উমা তার অচঞ্চল দেহ যষ্টিটাকে স্থির নিবদ্ধ রাখিয়া শুধু কালো বাঁকা চোখের চঞ্চল তারকা দুটীকে অপাঙ্গে ফিরাইয়া নিমেষের তরে বিজয়কে দেখিয়া লইল। বিজয়ও মুগ্ধনেত্রে তাহাকে সম্ভ্রম সহকারে দেখিতেছিল। উমাকে চল্‌তি মতে সুন্দরী বলা যায় না কেন না তার রং দুধে আল্‌তাও ছিল না, গড়নও অপ্সরা কিন্নরীর মত নিখুঁৎ ছিল না, তবু যা ছিল তাহার উপর নেশার চোখের রং পড়িলে তাকে সুন্দরী না বলিয়া কেহ থাকিতে পারে না। স্নানান্তে সে একটা চেলির কাপড় পরিয়া, কালো চুল পিঠে ছড়াইয়া, কপালে চন্দনের টিপ পরিয়া ফুলের সাজি হাতে শিব পূজা করিতে যাইতেছিল এমন সময় পঞ্চুর পরীক্ষা ! "কেমন শিবস্তোত্র মুখস্থ হয়েছে দেখি !" হাঙ্গাম বটে ! ঠিক এই বেশে এই অবস্থায় যখন শুচি দেহ সজ্জাকে লজ্জা দিয়া তাহার ভিতরের গুণপনা স্তোত্র আবৃত্তির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল সেই সময়ে বিজয় তাহাকে দেখিল। এই রকম একটা শুভলগ্নে কিশোর কিশোরীর দৃষ্টি বিনিময় হইলেই হৃদয় বিনিময় হয়—তা রূপ দু'জনের যেমনি হোক—এই লগ্ন উপস্থিত না হইলেও অপর্য্যাপ্ত দেহ সৌন্দর্য্য বা চিত্ত মাধুর্য্য কোন মতেই দ্রষ্টার মনে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য ঘটাইতে পারে না।

বিজয় বলিল—"ওকে ছেড়ে দেন না ?—"

প। নাঃ—একবার আমাদের দুজনের সামনে ও আবৃত্তি করুক তারপর ছুটী—

বি। কেন বিড়ম্বনা আর? না হয় একটু ভুল হ'ল—

প। না মশাই! শিবস্তোত্র ভুল উচ্চারণ হলে ভারি বিপদ—বিশেষ আইবুড়ো মেয়ে—

যুগপৎ বিজয় ও উমার দৃষ্টি পঞ্চুর মুখের উপর পড়িল। পঞ্চু কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিল—"বিপদ কি জানেন—শিব চটলে ওর শিবের মত বুড়ো বর ঘটিয়ে দিতে পারে—।' বলিয়া পঞ্চু মৃদু হাস্য করিল।

বিজয় উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল—"শিব এমন কুকীর্ত্তি করবেন কেন?

প। বলা যায় কি মশাই! ভাং সিদ্ধি খেকো মেজাজ—নিজেই তো ওই কাজ করে বসেছিলেন!

বি। হ্যাঁ, এক উমার ভাগ্যে যা ঘটেছিল—এ উমার ভাগ্যে—না সে ভয় নেই, দেবতাদের দিন গিয়েছে—"

এর পর কোনো মেয়ের এমনি ভাবে ওইরূপ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব? পাথরের মেয়ে হইলেও ছুটিয়া পলায়। গুরুবাক্য অমান্য মান্য বোধাবোধ কিছুতেই থাকে না—

বাড়ীর ভিতর উমাকে সেভাবে ছুটিতে দেখিয়া তাহার মাসী জিজ্ঞাসা করিল—কিলা উমি অমন করে ছুটছিস্ যে?" উমা কতকটা আপনমনে কতকটা উত্তরচ্ছলে বলিল—'দাদা কি দুষ্ট মাসীমা—' বলিয়া দুষ্টামির হেতু বা প্রকার ব্যাখ্যা না করিয়া ঠাকুর ঘরে ঢুকিল।

উমার পলায়ন দেখিয়া বিজয় একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া সে ভাব চাপিয়া বলিল—"খাসা মেয়েটার গলার সুর আর উচ্চারণ বোধ—"। পঞ্চু সে কথায় কাণ না দিয়া বলিল—"তারপর কি মনে করে বলুন তো?" বিজয় তাহার আগমন হেতু জানাইল। পঞ্চু শুনিয়া বলিল—"তার আর কি বেশতো চলুন না?" অন্য সময় হইলে পঞ্চু হয়তো ওজর আপত্তি করিয়া ইতস্ততঃ করিত কিন্তু সে দিনের সেই তরুণী দর্শনের মোহ তাহাকে টানিয়া আনিল। পথে আসিতে আসিতে পঞ্চু এ ও তা কত কথাই কহিতে লাগিল। বিজয় মধ্যে মধ্যে স্থানে অস্থানে 'হুঁ' 'হাঁ' 'না' বলিয়া উত্তর সারিয়া দিল। পঞ্চু বন্ধুর আলাপকুণ্ঠার হেতু হয়তো আন্দাজ করিয়াছিল।

পঞ্চুকে লইয়া বিজয় বাড়ীর ভিতর ঢুকিল এবং মাকে ডাকিয়া বলিল—

"এই নাও মা, এক আনাড়ী পুরুৎঠাকুর এনে হাজির তো করলাম—"। যজ্ঞেশ্বরী বাহিরে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"এইত ঠিকই এনেছিস্—আনাড়ী কেন? হ্যাঁ বাবা পূজা করতে জাননা?" পঞ্চু বলিল "জানি বৈকি মা? তবে চালকলা বাঁধতে এখনো তৈরি হয়ে উঠিনি।" বিজয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তরু ও নলিনীও আসিয়া পড়িয়াছিল; তাহারা ভাবিয়াছিল দাদা কাকে না কাকে ধরিয়া আনিয়াছে। পঞ্চুকে দেখিয়া তরু লজ্জাকুণ্ঠিত হইয়া পলাইয়া গেল।

পঞ্চু পূজায় বসিল। যজ্ঞেশ্বরী আয়োজন উপকরণ পুষ্প চন্দন প্রভৃতি সব দেখাইয়া দিয়া তরুকে ডাকিয়া বলিলেন—"তরি এই খানে থাক্ তোরা যা দরকার হয় যোগাড় করে দিবি—তরু অস্ফুটকণ্ঠে বলিল "আমি তো কিছু জানিনি মা—"। মা বলিল "শিখতে হবে না ওসব? কেবল ফ্যাসন করে চুল বাঁধা আর সুতো পশমের ছাদ্দ করাই শিখবি?" সদু বলিল "থাক্‌না দিদি নলি যাগ না!" যজ্ঞেশ্বরী বলিলেন—"না ওকেই যেতে হবে, বুড়ো ধেড়ে মেয়ে সব বিবিয়ানাই শিখতে মজবুৎ হবে?" তরু আর কি করিবে? মাকে সে চেনে, বিনা বাক্য ব্যয়ে নলির হাতটায় একটা টান দিয়া দুজনে গিয়া ঘরে ঢুকিল। নলিনী পঞ্চুকে দেখিয়াছে, স্বগ্রামবাসীতো বটেই, তাছাড়া এক পাড়ারই বাসিন্দা, শৈশব হইতে তাহাকে দেখিতেছে, তার লজ্জা করিবার কোনো হেতু নাই; করিলওনা; সে বেশ সপ্রতিভভাবে কথা কহিতে লাগিল। তরু একটা কাজের অছিলা করিয়া একপাশে সঙ্কুচিত হইয়া চোখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। একেবারে নির্ব্বাক। পঞ্চু পূজায় বসিল। দুই একবার তাহার প্রবল লোভ হইয়াছিল সেদিনের সেই নীরবভাষিনী লজ্জাকুণ্ঠিতা কিশোরীটিকে আর একবার দেখে। প্রথম দিন সে তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া দু একটা রহস্য রঙ্গ করিয়াছিল। আজ আর তাহা পারিল না। বেশ বুঝিল তার একটী ভাবান্তর হইয়াছে। ঠাকুর পূজা করিতে আসিয়া এরূপ ভাবান্তরের পরিচয় দিতে তার বড় লজ্জা বোধ হইল। তবু মানুষের মন, প্রকৃতি প্রবলা; সে একটা দরকারী দ্রব্যের অছিলা করিয়া দুই বোনকে ডাকিয়া বলিল দুর্ব্বা চন্দন কই নলিনী? দুই জনেই চাহিল। তরু চোখে চোখ পড়িতেই চোখ নামাইয়া লইল। নলি বলিল—"বা পঞ্চু দা সুমুখেই রয়েছে দেখতে পাওনি?" দেখিতে পায় নাই বা দেখে নাই একথা যে মিথ্যা তা পঞ্চু জানিত তবু নিজের চোখের দোষ না মানিয়া সে বলিল ও হরি! এই বুঝি দুর্ব্বা এ যে ঘাস! নলিনী বলিল

তরুদিদি তুলেছে আমি জানিনি। তরু ভারি মুস্কিলে পড়িল। দুর্ব্বা ও ঘাস যে একজাতিয় তৃণ নয়,উহাদের মধ্যে একটা ভেদ আছে এ সে জানিত না; জানিবেই বা কি করিয়া? সে নিজের অজ্ঞতা ও অপটুতার আভাষ এমনি করিয়া ওই ব্যক্তিটার কাছ হইতে পাইয়া ভারি অপ্রস্তুত হইল। নলিনী তার সে অবস্থা দেখিয়া একটু হাসিয়া নিজের অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে বলিল "তুমি থামো পঞ্চুদা আমি এনে দিচ্ছি ভাল দুর্ব্বো।" এই বলিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইল; তরুও সেই ওজরে তার সঙ্গে পলাইয়া লজ্জা বাঁচাইবার মতলবে উঠিয়া যেমনি যাইবে অমনি তার অঞ্চলের বাতাসে ঘৃত প্রদীপ নিবিয়া গেল। পঞ্চু লক্ষ্য করিতেছিল সে বলিল "বেশ দীপ নিবিয়ে দিলে?" বিড়ম্বনা আর কাকে বলে? ব্যাচারী যেন কাঁঠালের আঠায় জড়াইয়া গেল। সে দেশালাই লইয়া দীপ জ্বালিতে বসিল। দীপ জ্বালিয়া কম্পিত অঙ্গুলি যোগে সলিতাটা অকারণে উস্কাইয়া দিতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বরী দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পঞ্চু তখন চোখ বুজিয়া ন্যাস করিতেছিল। তরু অপাঙ্গে তাহাকে মুদিত নয়ন দেখিয়া উঠিয়া পড়িয়া আস্তে আস্তে পা টিপিয়া বাহিরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নলিনী দুর্ব্বা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "এই নাও দুর্ব্বো কত নেবে পঞ্চু দা।" পঞ্চুদার ধ্যান ভাঙ্গিল চোখ মেলিয়া দেখিল দীপ ধারিণীর নিষ্ক্রান্তা, দুর্ব্বাদায়িনী প্রবিষ্টা। কোনো মতে সে পূজা সারিয়া উঠিল। বিগ্রহশিলার অন্তরস্থ চিন্ময়রূপী সর্ব্বজ্ঞ এই দুইটি প্রভাত শিশিরের মত ফুল্ল ও পবিত্র তরুণ হৃদয়ের মধ্যে নিজের অনন্তলীলার প্রথমোন্মেষ দেখিয়া হাসিয়া প্রসন্নচিত্তে পঞ্চুর পূজা লইলেন। তারপর নান্দী মুখের হাঙ্গাম সারিয়া পঞ্চু বাহির হইয়া আসিল। রিক্ত হস্তে তাকে ঘরে ফিরিতে প্রস্তুত দেখিয়া যজ্ঞেশ্বরী বলিলেন—"ও কি নৈবিদ্য উপকরণ ও সব নিয়ে যাও বাবা—?" পঞ্চু বলিল—"না মা ওতে আমার অধিকার নেই। মাণিক কাকা ও সব নিয়ে যাবেন বা সেখানেই পাঠিয়ে দেবেন। এসব তাঁরই প্রাপ্য।" যজ্ঞেশ্বরী ও সদ্য তখন প্রণাম করিয়া দক্ষিণা দিতে গেল। পঞ্চু লাফাইয়া সরিয়া গিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ও কি করছেন সর্ব্বনাশ! কি মহাপাতক! আপনি মার বয়সী আমি ছেলের মত করছেন কি আপনারা!" যজ্ঞেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন "সে অন্য সময়, এ সময় তুমি পুরোহিত দেবতার পূজারী তোমার এখন ব্রহ্মার মান।" "না খুড়ীমা ওসব বুঝিনি রেখে দেন শাস্ত্র মাস্ত্র অত বাড়াবাড়ীতে নেই—মহাভারত—!" এই বলিয়া সে উপুড় হইয়া প্রণাম করিয়া যজ্ঞেশ্বরীর পায়ের

ধুলা লইয়া ছুটিয়া পালাইবে এমন সময় দেখে মাণিকরাম স্বয়ং উপস্থিত। তার মুখে চোখে ও ঠোঁটের কোনে বিরক্তির আভাষ। মাণিক চাপা ব্যঙ্গ স্বরে বলিল "পুজো করলে বাবাজী তুমি আর আমি নেবো চালকলা? তা কি হয় হে—"।

প। তোমার প্রাপ্য তুমি নেবে; আমি তো এ বাড়ীর পুরুৎ নই, তোমার বিলম্ব দেখে এঁরা ব্যস্ত হন তাই কাজ সেরে দিয়ে গেলাম। বাউনে বাউনের সাহায্য করে না কি? খুড়োর বুঝি ভয় হয়েছে আমরা যজমান ভাঙ্গালাম?

মা। ভাঙ্গালেই হেলো বাবাজী! তোমরা হলে কালেজে পড়া পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়ের ভাগ্নে আর আমরা টুলো বাউন! আমাদের কাজকর্ম্মে কি আর যজমানের মন উঠবে?

পঞ্চু প্রত্যুত্তর না দিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

মাণিক একটু এদিক ওদিক তাকাইয়া ভোলানাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তা হলে ভোলা দা—তবে কি তর্কসিদ্ধান্ত মশাই এবার হতে এ বাড়ীর যজমানি আরম্ভ কল্লেন?" ভোলার উত্তর দিবার আগেই যজ্ঞেশ্বরী সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন—"কাকে কি বলছ ঠাকুর? অতবড় একজন মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত কি দায় দুঃখে আমার বাড়ী যজমানি করতে আস্‌বেন? চালকলা কুড়োবার ব্যবসাদার আলাদা ধাতের—।" যজ্ঞেশ্বরীর দেখিয়া শুনিয়া মেজাজ তিক্ত হইয়া গিয়াছিল, তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। মাণিক মুখের মত উত্তর পাইয়া নিরুত্তর হইয়া চলিয়া গেল। যজ্ঞেশ্বরী অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন—'না মন্দ বিভ্রাট নয়—"।

ভোলানাথ দূরে বসিয়া নূতন হুঁকার জল সংস্কার করিতেছিল—মুখ না ফিরাইয়া বলিল 'জানি এই রকমটা হবে।' যজ্ঞেশ্বরী শুনিয়া বলিলেন "কি হবে জান্‌তে?" "এই আমার ছাদ্দ—" বলিয়া একটু চুপ করিয়া চাপা কণ্ঠে বলিল—"জানিইতো, মেয়েমানুষের আন্ বলতে টান্ সয় না—একেতো বাউনরা রেগে আছে একটা অছিলে পেলে হয়—যাগ্ কথায় কাজনি—" বলিয়া সে রান্না বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। যজ্ঞেশ্বরী বুঝিলেন একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় ভোলানাথ ভোর হইতেই বিমনা হইয়া আছে। পাছে কথা কাটা-কাটিতে কার্য্য বিভ্রাট ঘটে সেই ভয়ে তিনি চুপ করিয়া গেলেন। মনে মনে কেবল নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন যে, কেন এ নোংরা কাজে হাত দিতে গেলেন। লজ্জাও হইল এ সময় হঠাৎ উষ্ণ মেজাজের পরিচয় দিয়া ফেলিলেন।

ক্রমশঃ

হারা-মণি

[কাজী নজরুল ইস্‌লাম]

এমন করে অঙ্গনে মোর ডাক দিলি কে স্নেহের কাঙালী ?
কে রে ও তুই কে রে, আহা ব্যথার সুরে রে, এমন চেনা স্বরে রে,—
আমার ভাঙা ঘরের শূন্যতারি বুকের পরে রে —
এ কোন্ পাগল স্নেহ-সুরধুনীর আগল ভাঙালি ?
কোন্ জননীর দুলালরে তুই কোন্ অভাগীর হারা-মণি,
চোখ-ভরা তোর কাজল চোখে রে
আহা ছল ছল কাঁদন চাওয়ার সজল ছায়া কালো মায়া সারাখনই
উছ্‌লে যেন পিছল ননী রে !
মুখ-ভরা তোর ঝর্ণা-হাসি
শিউলি সম রাশি রাশি
আমার মলিন ঘরের বুকে মুখে লুটায় আসি রে !
বুক জোড়া তোর ক্ষুব্ধ স্নেহ দ্বারে দ্বারে কর হেনে যে যায়,—
কেউ কি তোরে ডাক দিল না ? ডাক্‌লো যারা তাদের কেন
দলে এলি পায় ?
কেন আমার ঘরের দ্বারে এসেই আমার পানে চেয়ে এমন থম্‌কে দাঁড়ালি ?
এমন চম্‌কে আমায় চমক লাগালি ?
এই কিরে তোর চেনা গৃহ, এই কিরে তোর চাওয়া স্নেহ হায় ?
তাই কি আমার দুখের কুটীর হাসির, গানের রঙে রাঙালি ?
হে মোর স্নেহের কাঙালী !!
এ-সুর যেন বড়ই চেনা, এ-স্বর যেন আমার বাছার,
কখন সে যে ঘুমের ঘোরে হারিয়েছিনু হয়না মনে রে,—
না চিনেই আজ তোকে চিনি আমারি সেই বুকের মাণিক
পথ ভুলে তুই পালিয়েছিলি সে কোন্ ক্ষণে সে কোন্ বনে রে !
দুষ্টু ওরে, চপল ওরে, অভিমানী শিশু !
মনে কি তোর পড়েনা তার কিছু ?
সেই অবধি যাদু কত শত জনম ধরে
দেশ-বিদেশে ঘুরে' ঘুরে' রে

আমি মা-হারা সে কতই ছেলের কতই মেয়ের মা হয়ে বাপ খুঁজছি তোরে
দেখা দিলি আজ্‌কে ভোরে রে !
উঠছে বুকে হাহা ধ্বনি
আয় বুকে মোর হারা-মণি,
আমি কত জনম দেখিনি যে ঐ মু-খানি রে !
পেটে-ধরা নাই বা হলি, চোখে ধরার মায়াও নহে এ,
তোকে পেতেই জন্ম জন্ম এমন ক'রে বিশ্ব-মায়ের ফাঁদ পেতেছি যে !
আচম্‌কা আজ ধরা দিয়ে মরা-মায়ের ভরা স্নেহে হঠাৎ জাগালি,
আহা গুহ-হারা বাছা আমার রে !
চিন্‌লি কি তুই হারা-মায়ে চিন্‌লি কি তুই আজ ?
ওরে আজ্‌কে আমার অঙ্গনে তোর পরাজয়ের বিজয়-নিশান চাইকি টাঙালি ?
হে মোর স্নেহের কাঙালী !!

নির্বাসিতের আত্মকথা

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রাজনৈতিক মতামত লইয়া মাঝে মাঝে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত আমাদের তর্ক-বিতর্ক হইত। বলা বাহুল্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের মহিমা প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোক ও রাজপুরুষের সহিত তর্ক উপস্থিত হইলে হারিয়া যাওয়াই ভদ্রসঙ্গত ; কিন্তু সে কথা জানিয়াও আমরা মাঝে মাঝে দুই চারিটা অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া ফেলিতাম। যেখানে গায়ের ঝাল মিটাইবার উপায় নাই, সেখানে জিহ্বা সঞ্চালন ভিন্ন আর কি করা যায় ?

রুশিয়ায় তখন বিপ্লব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, একদিন জেলার আমায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে তোমাদের সঙ্গে অতক্ষণ ধরিয়া তর্কবিতর্ক করেন, তা'র কি কারণ বলিয়া মনে হয় ?"

আমি বলিলাম—"কি জানি, সাহেব ? স্বজাতির গুণগান করা ছাড়া আর যদি কোন গূঢ় উদ্দেশ্য থাকে ত বলিতে পারি না।"

জেলার বলিলেন—"এ কথা বোধ হয় জান যে ছয় মাস অন্তর ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কাছে তোমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে এক একখানি করিয়া রিপোর্ট যায়। তোমরা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে যে মতামত প্রকাশ কর তিনি সেগুলি নোট করিয়া রাখেন, আর তাহার উপর নির্ভর করিয়াই রিপোর্ট প্রস্তুত হয়। চারিদিকে যেরূপ হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে, তাহাতে ইংরেজ যদি হারে, ত ল্যাঠা চুকিয়া গেল; আর যদি জয়ী হয় ত আনন্দের প্রথম ধাক্কায় তোমাদের ছাড়িয়াও দিতে পারে। ইংরেজ রাজত্বটা যে কি, তাহা আমি আইরিশ, সুতরাং ভাল করিয়া বুঝি। জেলখানার ভিতর সব সময় পেটের কথা মুখে আনিয়া লাভ নাই।"

ভাবিয়া দেখিলাম, কথাগুলো ত ঠিক। জেলখানাটা ঠিক বক্তৃতা দিবার জায়গা নয়। শত্রুর মুখ হইতেও উপদেশ শাস্ত্রমতে গ্রাহ্য; সুতরাং জিহ্বাটা সেই সময় হইতে অনেক কষ্টে সংযত করিয়া ফেলিলাম।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মাঝে মাঝে যুদ্ধের বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। জার্ম্মাণী যে কি ভীষণ রকম পাজি তাহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য। আমরাও এক বাক্যে জার্ম্মাণীর পাজিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাকে জানাইয়া দিলাম যে, মরিবার পর জার্ম্মাণী নিশ্চয় নরকে যাইবে। দেবলোকে ইংরাজের পার্শ্বে স্থান পাইবার তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই।

ইংরাজচরিত্রে একটা কেমন সঙ্কীর্ণতা আছে—সে কোন জিনিষের নিজের দিক ছাড়া পরের দিক সহজে দেখিতে পায় না! তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী যে চিরদিনই ইংরেজের আশ্রয়েই থাকিতে চায়, এ কথা বিশ্বাস করিবার জন্য ইংরেজের প্রাণ একেবারে লালায়িত! ভারতে ইংরেজ রাজত্ব যে আদর্শ শাসনযন্ত্রের খুব কাছাকাছি এ বিষয়ে তাঁহাদের বড় একটা সন্দেহ নাই।

কিন্তু এ বিশ্বাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের শেষ পর্যন্ত ছিল বলিয়া মনে হয় না! যুদ্ধের সময় ত বেচারা প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম করিলেন, কয়েদীর খরচ কমাইয়া সরকারী তহবিলে অনেক টাকা জমা দিলেন; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার পর নিজের একমাত্র শিশু কন্যাকে বিলাতে রাখিয়া আসিবার জন্য যখন ছয় মাসের ছুটী চাহিলেন তখন ছুটী আর মিলিল না! আবেদনের পর আবেদনের যখন কোনও উত্তর পাওয়া গেল না, তখন তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—"All governments are bad. I am an anarchist" শেষে চটিয়া গিয়া তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া বসিলেন—"The gods of Simla

are incorrigible"। কিছুদিন পূর্ব্বে মণ্টেগু সাহেবের রিফর্ম বিলের খসড়ায় যখন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে একেবারে সর্ব্বময় প্রভু করিয়া খাড়া করা হইয়াছিল, তখন ঐ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টই একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"তাহাতে কোন দোষ হইবে না। The government of India are sensible people." নিজের লেজে পা না পড়িলে কেহ পরের দুঃখ বুঝিতে পারে না।

যাক্—এ দিকে যুদ্ধ ত শেষ হইয়া গেল। যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন ছাড়া পাইবার আশা ভরসা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া মরণের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলাম, তখন দুঃখের মাঝখানে দিন একরূপ কাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু যুদ্ধের পর আবার কয়েদী ছাড়িবার কথা উঠিল। তখন আশা ও আশঙ্কায় দিন কাটান ভার হইয়া উঠিল। একদিন সংবাদ আসিল যে, যে সমস্ত যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদী পিনাল কোডের ৩০২ ধারা অনুসারে অপরাধী নয় তাহারা জেলখানায় যদি সাত বৎসর কাটাইয়া থাকে ত তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। আমাদের সাত বৎসর ছড়িয়া দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে সুতরাং প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইল। কিছুদিন পরে শুনিলাম যে, যে সমস্ত কয়েদীর মুক্তির জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কাছে নাম পাঠান হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে আমাদের নামও গিয়াছে; এখন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিলেই হয় কি আমরা নাচিতে নাচিতে দেশে ফিরিয়া যাইতে পারি।

এ পর্যন্ত কোনও যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদী পোর্টব্লেয়ার হইতে বাঁচিয়া, ফিরে নাই। ১৮৫৮ সালে যাহারা সিপাহি বিপ্লবের পর পোর্ট-ব্লেয়ার গিয়াছিল তাহাদের সকলকেই সেখানে একে একে মরিতে হইয়াছে। থিবর সহিত যুদ্ধের পর যে সমস্ত ব্রহ্মদেশীয় কয়েদী আসিয়াছিল তাহারাও কেহ ছাড়া পায় নাই। আজ আমাদের জন্য যে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে একথা সহসা বিশ্বাস করিতে সাহস হইল না। কিন্তু না বিশ্বাস করিয়াই বা করি কি? প্রাণ যে ফুলিয়া ফুলিয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছে।

ক্রমে জর্ম্মণীর সহিত সন্ধিপত্র-স্বাক্ষরিত হইল। ইংলণ্ডের বিজয় উৎসব ফুরাইয়া গেল। কিন্তু কই, কয়েদি ত ছাড়িল না। যুদ্ধ বন্ধ হইবার পর হইতেই দিন গণনা আরম্ভ করা গিয়াছে; দিন গণিতে গণিতে সপ্তাহ, সপ্তাহ গণিতে গণিতে মাস, ক্রমে মাস গণিতে গণিতে বৎসর ফুরাইয়া গেল; কিন্তু বিড়ালের

ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িল না। খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম যে অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষে বিজয় উৎসব হইবে সুতরাং মনের কোণে একটু আশাও রহিয়া গেল।

ভারতে যখন বিজয় উৎসব ফুরাইয়া গেল তখন মনটা ছটফট করিতে আরম্ভ করিল—খবর বুঝি এই আসে, এই আসে! শেষে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে খবরও একদিন আসিল। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আমাদের আফিসে ডাকাইয়া শুনাইয়া দিলেন যে সরকার বাহাদুর কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদিগকে বৎসরে একমাস করিয়া মাফ দিয়াছেন।—ব্যোম্ ভোলানাথ! এত দিনের আশা এক ফুৎকারে উড়িয়া গেল।

তখন দেখিলাম যে পোর্ট ব্লেয়ারে জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটান ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। তাই যদি করিতে হয় ত ভুতের বেগার আর খেটে মরি কেন? চিফ কমিশনারের নিকট আবেদন করিলাম যে সমস্ত মাফ লইয়া যখন আমাদের ১৪ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে তখন সরকারী প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমাদের জেলের কাজকর্ম্ম হইতে অব্যাহতি দেওয়া হোক। কিন্তু সে আবেদন পত্র যে চিফ কমিশনারের দপ্তরে গিয়া কোথায় ধামা চাপা পড়িয়া গেল তাহার আর কোন উত্তরই পাওয়া গেল না।

এই সময় জেল কমিটি পোর্টব্লেয়ারে আসিবার কথা ছিল। আমি স্থির করিলাম যে আমাদের যা কিছু বক্তব্য সমস্ত জেল কমিটির নিকট গায়ের ঝাল ঝাড়িয়া বলিয়া দিয়া তাহার পর কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িব। কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে? জেল কমিটি চলিয়া যাইবার অল্পদিন পরেই একদিন প্রাতঃকালে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আসিয়া আমাদের সংবাদ শুনাইয়া দিলেন যে, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট আমাদের আলিপুর জেলে পাঠাইয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন; সেখান হইতে আমাদের মুক্তি দেওয়া হইবে।

অল্পদিনের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের মতিগতি কি করিয়া পরিবর্ত্তিত হইল সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার কৌতূহল মনের মধ্যেই চাপা পড়িয়া রহিল। লম্বা হইয়া মেজের উপর পড়িয়া স্ফূর্ত্তিতে কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল, কেহ বা গান জুড়িয়া দিল। একজন বিজ্ঞ বন্ধু সকলকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন—"একটু স্থির হও, দাদারা; এ বাড়ীতে ফলার করতে এলে না আঁচানো পর্য্যন্ত বিশ্বাস নেই। শেষে মাঝ দরিয়ায় না জাহাজ ডুবিয়ে দেয়।"

জাহাজে চড়িবার আর দুই দিন বাকী। রাত্রে চোখে নিদ্রা নাই; আহারে প্রবৃত্তি নাই। কল্পনার শত চিত্র চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। বহুদিন বিস্মৃত সুপরিচিত মুখগুলি আবার মনের মধ্যে ফুটিতেছে। যাহাদের সহিত ইহকালের সব বন্ধন কাটিয়া গিয়াছিল তাহারা আবার স্নেহের শতডোরে বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দুই দিন কাটিয়া গেল। দল বাঁধিয়া ২৬ জন জেল হইতে বাহির হইলাম। তখনও কাহারও কাহারও পায়ে বেড়ী বাজিতেছে। জেলের বাহির হইয়াই শিখেরা আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওমা গুরুজী কি ফতে।" তাহার পর গান আরম্ভ হইল!—

"ধন্য ধন্য পিতা দশমেশ গুরু
যিন চিড়িয়াঁসে বাজ তোড়ায়ে—"

(হে পিতঃ, হে দশম গুরু! চটক দিয়া তুমি বাজ শিকার করাইয়াছিলে তুমি ধন্য!)

আজ আবার চটক দিয়া বাজ শিকার করিবার দিন আসিয়াছে তাই ঐ সঙ্গীতের তালে তালে আমাদের প্রাণও নাচিয়া উঠিল। মনে মনে বলিলাম—"হে ভারতের ভাবী গুরু, হে ভগবানের মূর্ত্তপ্রকাশ, সমুদ্র পার হইতে তোমার দীন ভক্তের প্রণাম গ্রহণ কর।"

তাহার পর জাহাজে চড়িয়া একবার পোর্টব্লেয়ারের দিকে শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম। Wordsworthএর কবিতা মনে পড়িল—

"What man has made of man."

জাহাজ তিন দিন ধরিয়া ছুটিয়াছে; মনটা তাহার আগে আগে ছুটিয়াছে। ঐ সাগর দ্বীপে বাতি জ্বলিতেছে, ঐ রূপনারায়ণের মোহনা। আজই খিদিরপুরের ঘাটে জাহাজ গিয়া পৌঁছিবে!

নাঃ—জাহাজ ত কৈ ডুবিল না! এ যে সত্য সত্যই ঘাটে আসিয়া লাগিল। পুলীশ প্রহরী আমাদের সঙ্গে লইয়া আলিপুরের জেলের দিকে চলিল।

আবার আলিপুরের জেল—কিন্তু সে চেহারা আর নাই! আমাদের শুভাগমন বার্ত্তা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কাছে গেল। আমাদের কাছে যা কিছু জিনিষ পত্র ছিল প্রহরীরা আসিয়া তাহা বুঝিয়া লইল। বড় বিশেষ কিছু ছিলও না। পোর্টব্লেয়ার হইতে আসিবার সময় বইটই সমস্ত নূতন

নূতন ছেলেদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। স্থির করিয়াছিলাম দেশে ফিরিয়া আর মা সরস্বতীর সহিত কোন সম্বন্ধ রাখা হইবে না। চুপ করিয়া শুধু দুটি ভাত খাইব আর পড়িয়া থাকিব।

ঘণ্টা খানেক জেলে থাকিবার পর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন শনিবার। আমরা ভাবিয়াছিলাম সেদিন ও তাহার পরদিন বুঝি আমাদের জেলেই থাকিতে হইবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা বোধ হয় আজই বাহিরে যাইতে চাও? কলিকাতায় তোমাদের থাকিবার জায়গা আছে?" বাহিরে যাইবার নাম শুনিয়া আমরা লাফাইয়া উঠিলাম। মুখে বলিলাম—"জায়গা যথেষ্ট আছে, আর মনে মনে বলিলাম—"জায়গা না পাই রাস্তায় শুয়ে থাকবো, একবার ছেড়ে ত দাও।"

সে রাত্রে হেমচন্দ্র, বারীন্দ্র ও আমি ছাড়া পাইলাম। কিন্তু যাই কোথায়? শ্রীযুক্ত সি, আর, দাশের বাড়ী গিয়া দেখিলাম তিনি বাড়ী নাই; তখন সেখান হইতে ফিরিয়া হেমচন্দ্রের বন্ধু হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায়ের বাড়ীতে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। হেমচন্দ্র ও বারীন্দ্র সে রাত্রে সেইখানেই রহিয়া গেল আর আমি চন্দননগরে বাড়ী যাওয়াই স্থির করিলাম। ভাবিলাম রাত ১০৷৷০ টার সময় হাবড়ার ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণ ধরিব।

কিন্তু বাহির হইয়া দেখিলাম যে কলিকাতার রাস্তাঘাট সব ভুলিয়া গিয়াছি। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া হাজির হইলাম, তখন ট্রেণ ছাড়িয়া গিয়াছে। ভবানীপুরে ফিরিয়া যাইবার আর প্রবৃত্তি হইল না। শ্যামবাজারে শ্বশুর বাড়ী—ভাবিলাম সেইখানে গিয়া রাতটা কাটাইয়া দিব। শ্যামবাজারে যখন পৌছিলাম, তখন রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীর দরজা বন্ধ। দুই চারিবার কড়া নাড়িয়া যখন কোন সাড়া পাইলাম না, তখন ভাবিলাম "কুচ পরোয়া নেহি; আজ রাতটা কলিকাতায় রাস্তায় না হয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব।" প্রাণে একটা নূতন রকম আনন্দের দেখা দিল। আজ বার বৎসর পরে খোলা রাস্তায় ছাড়া পাইয়াছি! সঙ্গে জেলার নাই, পেটি অফিসার নাই, একটা ওয়ার্ডার পর্য্যন্ত নাই! অতীতের বন্ধন কাটিয়া গিয়াছে, নূতন বন্ধন এখনও দেখাদেয় নাই। আজ সংসারে বাস্তবিকই আমি একা। কিন্তু এই একাকিত্ববোধের সঙ্গে কোন বিষাদের কালিমা জড়িত নাই, বরং একটা শান্ত আনন্দ উহার তালে তালে ফুটিয়া উঠিতেছে।

শ্যামবাজার হইতে সার্কুলার রোড ধরিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে রওনা হইলাম। বার বৎসর জুতা পরা অভ্যাস নাই, সুতরাং আজ নূতন জুতায় পা একেবারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। জুতা খুলিয়া বগলে পুরিয়া চলিতে লাগিলাম। বগলে পুঁটুলী দেখিয়া রাস্তায় এক পাহারাওয়ালা ধরিয়া বসিল—কোথা হইতে আসিতেছি কোথায় যাইব ইত্যাদি ইত্যাদি। একবার মনে হইল সত্য কথা বলিয়া দিই যে আমি কালাপানির ফেরত আসামী; তাহা হইলে আর কিছু না হোক, থানায় একটু মাথা গুঁজিবার জায়গা পাওয়া যাইবে। তাহার পর ভাবিলাম আর সত্যনিষ্ঠার বাড়াবাড়ি করিয়া কাজ নাই। একবার সত্য কথা বলিতে গিয়া ত বার বৎসর কালাপানি ঘুরিয়া আসিলাম। শেষে বলিলাম—"আমি কালীঘাট হইতে আসিতেছি, শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইব।" কনষ্টেবল সাহেব আমার বগলের পুঁটুলি পরীক্ষা করিয়া অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি উড়ে?" বহু কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলাম—"হাঁ"। তখন তাঁহার নিকট হইতে যাইবার অনুমতি পাইয়া তাঁহাকে একটা দীর্ঘ সেলাম দিয়া আবার রওনা হইলাম। সেই রাত্রে রাত একটার সময় গাড়ী চড়িয়া যখন শ্যামনগরের ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম, তখন রাত দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। নৌকায় গঙ্গাপার হইয়া যখন নিজেদের পাড়ার ঘাটে আসিয়া নামিলাম, তখন রাত প্রায় তিনটা; রাস্তা-ঘাট একেবারে জনশূন্য; টিম টিম করিয়া রাস্তার মোড়ে মোড়ে এক একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলিতেছে। বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দেখিলাম, বাড়ীর চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। জানালায় ধাক্কা মারিয়া ভায়াদের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে একটা জানালা খুলিয়া গেল আর ভিতর হইতে হর্ষোদ্বেগ-চঞ্চল একটি সুপরিচিত বামা-কণ্ঠে প্রশ্ন হইল—"তুমি কে?" সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জানালা খুলিয়া মা ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহার আশা সকলেই ছাড়িয়া দিয়াছে, সে যে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, এ-কথা বিশ্বাস করিতে যেন কাহারও সাহসে কুলাইতেছে না।

বাড়ীর ভিতর চারিদিকে একটা ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। এক পাল ছেলে আসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে আমার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কারা এরা? ইহাদের কাহাকেও যে চিনি না। একটি ছোট ছেলে একটু দূরে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল—"এই

আপনার ছেলে।" যাহাকে দেড় বৎসরের রাখিয়া গিয়াছিলাম, সে আজ তের বৎসরের হইয়াছে।

আবার নূতন করিয়া সংসারের খেলা-ঘর পাতিয়া বসিলাম।

ওগো খেয়াপারের কর্ণধার! এবার কোন্ কূলে পাড়ি দিবে?

স্বরাজ

[শ্রীমতী লীলা দেবী]

প্রাণের মাঝে যে প্রেম জাগে ফুরায় না তা ফুরায় না,
চোখেই শুধু যে প্রেম জ্বালা জুড়ায় না তা জুড়ায় না।
সবার সুখে যে সুখ শোভে শেষ নাই তার মরণেও,
নিজের যে সুখ, অলীকতায় হারায় মেঘের বরণেও।
সবার লাগি বিলায় যে ধন বিভব যে তার অফুরণ,
নিজের তরে রাখলে পরে অভাব চিরই অপূরণ।
আপন জনেই বাস্‌লে ভালো মৃত্যু আসে অমৃত,
ভুবনকে যে বাসে ভালো প্রিয় যে তার অমৃত।
ছড়িয়ে দে'ভাই, ছড়িয়ে দে'ভাই, নিজের ব'লে রাখিস্‌নে,
কাঙ্গাল হ'য়ে হ'না রাজা,—স্ব—রাজকে আর ডাকিস্‌নে !!

আইরিস জাতি-শিল্পীর একজন

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।]

"The Nation & The Athenæum" কাগজের মে মাসের সংখ্যায় আয়র্লণ্ডের "টলষ্টয়", কবি ও দেশনেতা জর্জ্জ রাসেলের (George Russell) জীবন-কথা বেরিয়েছে। আইরিশ জাতির জীবনবেদ যে কয়জন ঋণীর বরপুত্র মিলে উদ্ধার করেচেন কবি জর্জ্জ রাসেল তার একজন। তিনি (A.E.) এ, ই এই ছদ্ম নামে কবিতা লিখে মরা আয়র্লণ্ডে জীবনের সাড়া ও আইরিশ কাল্‌চারের লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিলেন। "He belongs to no party ; he is not a leader of revolt ; he has no political follwing."—"এ, ইর কোন নিজের দল নাই ; তিনি যে কোন বিশেষ বিপ্লবের নেতা তা নন; তাঁর পেছনে তাঁর মতে সায় দেবার পঙ্গপালও নেই।" অথচ আজ আয়র্লণ্ডের জাগরণের দিনে এ, ইকে ভক্তি না করে এমন মানুষ ওদেশে নেই বললেই হয়,—"Just because he is so far removed from all extremes, except the extremes of passionate love for his couutry and persistent reasonableness about it ; "মতের ও দলাদলির কচকচি থেকে এমনতর মুক্ত মানুষ বলেই তাঁর ওপর দেশবাসীর এত শ্রদ্ধা, তিনি অসীম দেশপ্রেমের আধার হয়েও বুদ্ধিতে কতই না ধীর, কতই না সাবধানী"।

জর্জ্জ রাসেল বক্তৃতা দিয়ে হট্টগোল বাধাবার ধার বড় একটা ধারেন না, কিন্তু ডাবলিনে মার্কিন ধর্ম্মঘটের সময়ে তাঁর একটি বক্তৃতায়ই দেশ টলে উঠেছিল। রাসেল কবি, চিত্রশিল্পী, ভাবুক অথচ পাকা অর্থনীতিবিৎ ও কাজের মানুষ। আইরিশ জীবনের গভীর সত্য তলিয়ে দেখে তাঁর ছবিতে কবিতায় এই আত্মহারা জাতীর আত্মধন ও আত্মবল খুঁজে পেয়েছেন ও তাঁরই স্পর্শে আয়র্লণ্ড আজ অজেয়। শুধু কি তাই? কো-অপারেটিভ প্রণালীতে এই কবি-কর্ম্মী সমস্ত দেশ জুড়ে দুধ মাখম ক্ষীর নবনীর ব্যবসায় (creameries) গড়ে তুলে অন্নহীন চাষার ঘরে শ্রী ফিরিয়েছিলেন, তার ফলে দেশের যে শ্রীবৃদ্ধি, যে শক্তিলাভ ঘটেছিল তা' সমস্তটা বিপ্লব যুগ ধরে পুলিশ ও পল্টন লেলিয়ে ইংরাজরাজ ভেঙে ভেঙেও নিঃশেষ করে উঠতে পারেনি। আপন জীবনে সত্যদর্শন ও কর্ম্মপটুতা এক আধারে অপূর্ব্ব

অনুপমতায় ফুটিয়ে এই অসাধারণ মানুষ দেখিয়েছেন, যে, কবি ও কর্ম্মী একই আধারে কি করে হয়, ইংরাজ সাহিত্যিক John Masefield বলেন মানুষ দুই রকমের আছে, শক্তির মানুষ ও আনন্দের মানুষ "capable of energy and those capable of ecstasy. But to A. E. belongs the joy of both. By energy he has sought to save his country; by ecstasy he continually saves himself" এ, ই নিজে আনন্দ ও শক্তির সমান আধার; তাঁর অন্তরের শক্তিতে তিনি দেশকে মৃত্যুথেকে বাঁচিয়েছেন এবং সেই অন্তরের আনন্দ ধারায় স্নান করে তিনি নিজে অমর।

এ, ইর আকৃতি দেখেই বোঝা যায় তাঁর শক্তি বহুমুখী, সে আধারে যেন সবই সম্ভব। সেই দীর্ঘচ্ছদ দেহ শ্মশ্রু ও কেশে ঢাকা প্রকাণ্ড মাথা, সমস্ত দেহখানির গাম্ভীর্য্য ও সংযম, সে নীল আকর্ণ চক্ষের তেজ ও করুণা, সব কিছু যেন কেবলি এই কথাই বুঝিয়ে দেয়, যে, এ মানুষে অনেক বিপরীত ব্যাপারই কেমন করে যেন সামঞ্জস্য পেয়েছে; এ মানুষ যেন রুদ্রের তেজ ও দেবতার করুণায় গড়া। আয়র্লণ্ডে গত ছয় মাসের ব্রিটিশ অত্যাচারের সম্বন্ধে টাইম্‌স্ কাগজে তাঁর পত্রগুলির ছত্রে ছত্রে অর্থনীতির কি গভীর জ্ঞান, কত ক্রোধ অথচ কত সহিষ্ণুতা মাখান! যখন ডাবলিন, কর্ক, লিমারিক, গ্যালওয়ে, ট্রলিতে পুলিশ ও পল্টনের পৈশাচিক উৎপীড়নে ইংরাজের মাথাও হেঁট হয়েছিল, তখন এ, ই শান্ত ধৈর্য্যে বলেছিলেন, "প্রত্যেক মানুষের মাঝে এমন কোন দেব অংশ লুকান আছে যা'তে আঘাত দিলে সে আধারেও দয়া ধর্ম্ম জাগে; মানুষে সেই দেবতা খুঁজে বার করাই হলো আসল কাজ।" সেই পাশব উৎপীড়নের কাল-সন্ধ্যায় যে মানুষ এমন কথা ভাবতে ও বলতে পারে সে আবার বিপ্লববাদী! জর্জ্জ রাসেল আলষ্টারম্যান; কবি রুডিয়ার্ড কিপ্লিং আলষ্টারকে গালাগালি দিয়ে কবিতা লেখায় তার উত্তরে এই তিনি লেখেন, "তুমি এই দেশের সম্বন্ধে মূর্খ, আর আমার সারা জীবন দিয়ে আমি আলষ্টারকে চিনি, এবং তাই থেকে আমি বলছি তুমি তোমার প্রতিভার এই অপব্যবহারে আয়র্লণ্ডের বিশেষ ক্ষতি করতে প্রয়াস পেয়েছ। পথে মারামারি দেখে যেমন গুণ্ডা পক্ষাপক্ষ বিচার না করে শুধু গুণ্ডামীর উত্তেজনার লোভে একটা যাহোক দলে যোগ দেয়, তোমারও এ ব্যবহার ঠিক সেই রকম। জগত তোমার কথা শোনে, আর, তুমি কিনা জগতের কানে বিষাক্ত অজ্ঞানের বাণী ঢেলে দিলে! ভগবান তোমার হাতে বাণীর হাতের বীণা তুলে দিয়েছিলেন, তুমি সে বীণা চিরদিন শত্রুর

পক্ষ হয়ে দুর্ব্বলের অহিতে বাজিয়েছ। তুমি আপন শক্তি দিয়ে তাকেই ব্যথায় জর্জ্জর করেছ, যে জগতে দুঃখী ও দুর্ব্বল কিন্তু ভগবান যার বল ও ভরসা, তুমি আঘাত করেছ করুণা, সত্য, ন্যায় ও স্বর্গের বিরুদ্ধে; তাই ভগবানও তাঁর দিব্য দর্শনের জ্যোতি তোমার হৃদয় থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। তাই তোমার এ কবিতা তুচ্ছ পয়ারে সংবাদপত্রে খেলা কথা ছাড়া আর কিছুই হয় নি। তোমার কবির আসন ভগবানের আদেশে ঘুচে গেছে।"

এ, ইর প্রকৃতিতে শক্তি ও আনন্দের খেলা যেন ছায়াবাজির মতই ঘুরে ফিরে হয়। Imaginations and Reveries নামে তাঁর নতুন বইখানির ভূমিকায় রাসেল এই কথাই নিজে বলেছেন, "কলা শিল্পের আনন্দে ডুবে থেকেও আমি যেন সুখ পাইনি। কিসে যেন আমায় ভাঙা আইরিস জীবন গড়ে তুলতে জোর করে সেই কাজে টেনে নিয়ে গেছে। যতক্ষণ না আইরিশদের সঙ্গে জুটে আয়র্লণ্ডের জীবন নতুন করে গড়তে কাজে না নেমেছি ততক্ষণ আমার বিবেক জ্ঞান যেন আমায় এই প্রেরণা দিয়ে দিয়ে জাগিয়ে রেখেছিল, ক্রমাগত এই পথেই ঠেলেছিল। এই দেশের মাটিতে আমার জন্ম, তাইতে আমায় দেশ প্রেমিক করেছে; কিন্তু যে পরমসত্তা ভগবানের অংশ এই দেহে বর্ত্তমান সে ক্রমাগতই বুকের মাঝে যেন বলেছে, অনন্তের রাজনীতিই তোমার জীবনবেদ, সকল জাতির মানুষ যার সন্তান সেই বিশ্বরাজ তোমার রাজা। কোন একটা আন্দোলন জাগাতে গেলে গোঁড়া না হয়ে উপায় নেই। আমার প্রকৃতিতে শক্তিই গড়েছে কিন্তু জ্ঞান কালাপাহাড় হয়ে যেন ক্রমাগত ভেঙেছে।"

জর্জ্জ রাসেলের এই "Imaginations & Reveries" ১৯১৮ সাল অবধি গত পঁচিশ বৎসরের আইরিশ জীবনের অন্তর ও বাহিরের ইতিহাস। "We are shown once more the material value of those poets, scholars, essayists who began to infuse a new spirit into their nation about thirty years ago—the men who rescued old history and legend, the founders of the Gaoelic League, the creators of the Irish Drama, the singers of lyrics most beautiful in the world, and the originators of Sinn Fein." এই বইখানি পড়লে চোখের সামনে আবার যেন দেখতে পাই তাঁদেরই, যে কবি ও চিন্তাশীল লেখকেরা ত্রিশ বছর আগে এই মরা আইরিশ জাতির মধ্যে জীবন সঞ্চার কর

ছিলেন, যাঁরা লুপ্ত আইরিশ ইতিহাস ও পুরাণ পুনরুদ্ধারের ব্রতই জীবন-ব্রত করেছিলেন, যাঁরা গেলিক লিগের প্রতিষ্ঠাতা ও সিনফিনের মূল।

আইরিশ দেশমাতার অন্তরের মহিমা দেখাতে গিয়ে, রাসেল স্তুতিও করেছেন, আবার দেশের মেকি লেখকদের নিন্দারও ত্রুটী করেন নি। কৃষি-যৌথ কারবারে দেশকে শ্রীবৃদ্ধিতে বড় করেও এ কবিপ্রাণ যেন সুখ পায়নি—"I hate to hear of stagnant societies who think because they have made butter well that they have crowned their parochial generation with a halo of glory." "পূর্ণ জীবনে পঙ্গুর মত এই সব কৃষি সমবায় সমিতি ভাল মাখন তৈয়ারী করেই যখন ভাবে যে গ্রাম্য জীবন তারা যশের আলোয় সার্থক করেছে, তখন আমার মনে ঘৃণার উদয় হয়।" জর্জ্জ রাসেল এ কথা বলতে পেরেছিলেন বলেই তিনি এত বড়; বিধাতা একটি গাছের মাঝে কত রূপ কত রস কত বর্ণগন্ধের ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন, কিন্তু বিশ্বকবির প্রাণ তাই গড়ে যদি সুখ পেত তা'হলে এ বসুধা এমন অনুপম করে তুলতো কে বল দেখি? সেই অমৃতত্বের আস্বাদ বুক ভরে পেয়ে জর্জ্জ রাসেল কর্ম্ম করেও কর্ম্মের অতীত। তাই তিনি আর এক জায়গায় লিখেছেন, "the end of life is not comfort, but devine being". "জীবনের অর্থ ঐহিক সুখ নয়, ভাগবত সত্তাই জীবন।"

মহানৃত্য

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায়]

সতীর মরণে ব্যথিত ভুবন,
স্তম্ভিত মহাকাল,
ম্লান হ'য়ে গেল সুদূর আকাশে
রবির কিরণজাল।
স্পর্শ-সুভগ বাতাস ভরিল
ভৈরব কালানলে,
মূর্চ্ছিত-তনু দিগ্‌বধূগণ
পড়িল সাগর-জলে।

২

লক্ষ্য বিহীন রবি শশি তারা
মরণ-বিষাণ-গানে,
ছুটে উচ্ছল অতল-সলিল
তাণ্ডব সেই তানে;
পাণ্ডুর নভে ছুটে ধূমকেতু—
বজ্রের বিভীষিকা,
ধরণীর গায় কে মাখালে, হায়,
শোণিতের ললাটিকা!

৩

বিদ্যুত-হাসি ধ্বংস-আহবে
ফুটিছে ভীষণ হয়ে,
ত্রিভুবন বুঝি ভেঙ্গে খসে পড়ে
পাতাল-গর্ভে গিয়ে!
বাসুকীর ঘুম ভাঙ্গিল আজি কি,
তাই কি নৃত্য আজ?
টুটিল আজি কি প্রকৃতির চির
শান্ত মধুর সাজ?

৪

গগন পবন ভরিয়া উঠিল
প্রলয়ের 'হাহা'-রবে,
ভূতপ্রেত আর দানব যক্ষ
যোগ দেয় সে আহবে।
বিশ্বভুবন শৃঙ্খলা-হারা,—
কোথা বিষ্ণুর জ্ঞান!—
সতীর মরণে ভেঙ্গেছে আজিকে
মহেশের মহাধ্যান!

৫

তাই বুঝি সেই ধ্যান-প্রশান্ত
দুইটী নয়ন দিয়া
তাপসীর তাপ-গৈরিক-জ্বালা
বেয়ে চলে ফাটি হিয়া?
চারু জটাভার স্রস্ত শিথিল,
কোথায় বাঘের ছাল!
কোথা সে তৃপ্ত দুখের গর্ব্ব
ফণী-বিভূষণ-মাল?

৬

ত্রিশূল-শিখরে চারু সতীদেহ—
মধুমালতীর মালা,
পাষাণ ফাটিয়া ধারা হয়ে ছুটে
মহেশের মহাজ্বালা।
ক্ষেপা নটেশের প্রতিপাদক্ষেপে
সারা ত্রিভুবন কাঁপে,
প্রলয়ের কোলে ডুবিবে সকলি
দক্ষের মহাপাপে!

৭

তাথৈ তাথৈ প্রলয়োঙ্কারে
রুদ্র-বিনাশ-বাণী,

স্বরগ-দুয়ারে স্তব্ধ দেবতা
করে সবে কানাকানি।
শক্তি যে ছিল ধ্যানের আসনে
জীবনের নিঃশ্বাস,—
বিচ্ছেদে তার ব্যর্থ সকলি—
কোথা মিলে আশ্বাস?

৮

ধ্যানের সঙ্গে মিশেছিল কি সে
শান্তি-আশীষ সম?
ভুবনে ভুবনে ছিল কি ভরিয়া
তরুণ স্বপ্ন কম?
নয়নে ছিল কি অমৃত-বর্ত্তি
হৃদয়ের রসায়ন,
শ্মশানচারীর সংসার-দেবী—
দেবতার উপায়ন?

৯

ত্রিলোচন শিব হে মহাজ্ঞান!
ফুরাল শ্মশান-লীলা?
শেষ হ'ল তব দুঃখ-সাধন—
জীবনের প্রেম-খেলা
জীর্ণ গলিত শব দেহ—তবু
বেঁধেছ বুকের মাঝে,
নৃত্য-দোদুল অঙ্গে অঙ্গে
ঘোর উল্লাস রাজে!

১০

প্রেম বিনা বুঝি জ্ঞান নাই, ওগো,
জ্ঞানের অভাবে লয়?
তাই কি জাগালে সতীর মরণে
ধ্বংসের মহাভয়?

একপল যারে ছাড়োনি জীবনে
মরণেও তারে নিয়ে—
উদার বিশ্বে ছুটিয়া চলিলে
ধ্বংসের গান গেয়ে ?

নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

যমুনা

হ্যাঁ—ভারী চালাকী, না ?—জগৎশুদ্ধ লোকের বুদ্ধি আছে কেবল আমারই নেই—না ? আমি মোটে হাসি, আর সবাই দেব দেবী, ঋষি মহর্ষি ছাই ভস্ম কত কি ! আমার সঙ্গে কথা কইবার সময় কারুরই সমিহ করার দরকার নেই, লজ্জা করার দরকার নেই, যা ইচ্ছে বল্লেই হ'ল, যেমন করে ইচ্ছে হুকুম করলেই হল। আর আমি হইছি থেঁকী কুকুর, কাজও নেই অবসরও নেই। কেবল তু করে ডাকলেই ছুটে যাব। 'এঁর খোজ নাও,' 'ঐ কাজটা করবার জন্য হুকুম নিয়ে এস,' 'এই ব্যাপারে যাতে এষ্টেট থেকে টাকা বেরোয় তার জন্য দয়া করে বল'—আমি বুঝি তোমার আর সংসারের মধ্যেকার টেলিগ্রাফের তার ? না আমি তা নই।

কেন তা হব ? আমি চিরদিন স্বাধীন, কেন আমি তোমার ছলভরা হুকুম মেনে চলব ? দেখাও যেন কতই পরের হুকুমে চলছ, পরের দরকারে খাটছ, কিন্তু আমি তোমার মুখের কাপড় উঠিয়ে দেখে নিয়েছি—তা তুমি যতই তোমার ফটোই গোপন কর, আর যতই চাপকান চোগা লাগিয়ে আর্দ্দালি সেজে বেড়াও। আমি তোমায় চিনিছি মশায় চিনিছি। ও সব চালাকী আর যার কাছে হয় কর গিয়ে, আমার কাছে ওসব চলবে না।

আমি ত' আর কোনো রকম চশমা চোখে দিয়ে বসে নেই, যে কাছে কিছুই দেখতে পাব না, শুধু দূরের দিকে চেয়ে দূর দেখবার আশায় বসে থাকব—আর নিকটের যা কিছু হাত ফসকে পালিয়ে যাবে ? ও গো মশায় তা হবে না—আমার কাছে তা হবে না। আমি ধর্ম্ম মানিনে, কর্ম্ম মানি নে, শাস্ত্র মানিনে, মন্ত্র মানিনে। আমি শুধু মানি এই আমার বাইরের চোখ

দুটোকে আর আমার অন্তরের চোখকে। এই তিনটেতে যা ধরা পড়বে তাই আমার কাছে সত্য, বাদ-বাকি সমস্তই মিথ্যে মায়া ভোজবাজী।

ঐ যে দিদির সন্ন্যাসী ম'শায় আজ কতদিন হতে নাসাগ্র বদ্ধদৃষ্টি হয়ে বসে আছেন, মনে করছেন যে ওঁর ঐ চোখ দুটো যে মাঝে মাঝে ইদিক-উদিক নড়ছে, এ বুঝি কেউ দেখতে পায়নি ! হায় রে বোকা মানুষগুলো ! বিশেষতঃ ঐ সব একাগ্র মানুষগুলো ! ওরা যতই একাগ্র ওরা ততই যে বোকা—ততই যে স্বচ্ছ, এটা ওরাই সবচেয়ে কম জানে। ঐ যে আমার দিদিটী যিনি মনে করেছিলেন যে পরীক্ষা না করে কাউকে তিনি তাঁর অন্তরের মধ্যে, বিশ্বাসের মধ্যে, স্থান দেবেন না, তিনি যে আজ একাগ্র বিশ্বাসে ঐ সন্ন্যাসীকেই আশ্রয় করেছেন, এটাই ওঁর চোখে পড়ছে না। এমনি অন্ধ এই সব যোগী মানুষগুলো !

কিন্তু সবারই যোগ ভাঙ্‌ছে ! আমি ধীরে ধীরে দেখতে পাচ্ছি সবাই বিয়োগের মধ্যে দিয়ে গুণে পৌছচ্ছেন এবং শেষে ভাগে পৌছে আপনাকে খণ্ড খণ্ড করে বিলিয়ে দিতে পথ পাবেন না, এও আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

আর তুমি—তুমি যে কেঁচে গণ্ডুস্ করতে এসেছ, তুমি মনে করেছ যে বুঝি তোমার অন্তরের সন্ন্যাসীটা বুঝি তোমায় ছেড়েছে—তোমার বৈরাগ্যের ভূত বুঝি তোমার ঘাড় থেকে নেমেছে ? নামেনি মশায় নামেনি—

কিন্তু সেইটেই ত' দুঃখ ! কেন সে ভূত ছাড়ছে না তোমায় ? কি চাও তুমি ? কাকে চাও তুমি ? কি মহা সত্য তোমার কাছে এখনো অপ্রকাশিত আছে ? ওগো তোমার মনের ঝুলির মধ্যে এখনো কোন মহাভিক্ষা এ সংসার এ জগৎ দেয় নি ? যে সত্যের লোভে তুমি তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, যাগ যজ্ঞ, কৃচ্ছ বৈরাগ্য সব ছেড়ে দাসত্বের মিথ্যাকে অবলম্বন করেছ ? সে কথা কি বলবে না—কখনো বলবে না, কাউকে বলবে না ?

কিন্তু না বললেও ত' আমি ছাড়ব না। আমিও তোমারই চার পাশে ভ্রমরের মত ঘুরব ; দেখি তোমার মুদিত মন-পদ্মের গোপন মধুটুকু চুরী করতে পারি কিনা। আমিও ছাড়ব না, এমনি করে আমার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার মনের দ্বারে আঘাত ক'রব। দেখি সে দুয়ার কতদিন বন্ধ থাকে।

* * *

ব্যথাকে দেখিনে বলে, পিসীমা আমায় বকছিলেন, কিন্তু ব্যথাকে নিয়ে দিদিত' দেখছি খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তা হলে আর আমার দরকার কি? সংসারের কাজ? সেও ত' বেশ চলছে, কৈ কারুর পাতে কিছু পড়ে নষ্টও হচ্চে নাত'—আর কেউ কিছু পেলেনা বলে কান্নাকাটিও ত' করছে না। যে সত্য-সত্যই কান্নাকাটী করছে, সে যদি তার এই ছাব্বিশ বছরের একটানা দুর্ভিক্ষ দুদিনের জন্যে মেটাবার চেষ্টা করে, তা হলেই এত কথা উঠবে? সংসারের এ কেমন বিচার!

না আমি এতদিন ধরে পেরেছি—আর যদি না পারি? তাতে তোমাদের এত কলরব কেন উঠবে? পাঁচজন কাণাকানি করছে? করুক গে, কবে সে কাণাকানিতে তোমরা কাণ দিয়েছ? তোমরা যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত একটা সংসার গড়ে তুলেছ, এই যে তোমাদের ভারতছাড়া এই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-ছাড়া বাড়ীটা, এই মনু-যাজ্ঞবল্কের দেশের বুকের ওপর প্রতিষ্ঠা করেছ এর জন্য কার মুখের দিকে তোমরা চেয়েছ? কবে চেয়েছ? কখন না।—তবে এই বাড়ীরই একজন হয়ে আমিই বা কার মুখ চেয়ে নিজেকে নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখব?

না—তোমরা যখন কোনো নিয়ম মান নি, তখন আমিই বা মানব কেন? তোমরা যখন একটা ছায়ার পেছনে ছুটছ, তখন আমিই বা ছুটব না কেন?

ছায়া! মিথ্যে! মরীচিকা! হোক মরীচিকা তবু আমি যাব। সেই দিকেই যাব।

মিথ্যে নয় এ সংসারে কোন্‌টা? সারা সংসারই যে মায়ার পেছনে ছুটছে। আমিই কেবল্ চুপ করে থাকব? এ কেমন বিচার তোমাদের?

মিথ্যে নয় গো ম'শায়রা মিথ্যে নয়। এ যদি মিথ্যে হয় তা হলে গাছে ফুল ফোটাও মিথ্যে, আকাশে চাঁদ ওঠাও মিথ্যে, প্রভাতে সূর্য্য ওঠাও মিথ্যে, জগতের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সবই মিথ্যে।

মনে মনে সবাই জানে—কিছুই মিথ্যে নয়, তবু জোর করে বলবে মিথ্যে—মায়া—ভেল্কি—ভোজবাজী। এই মিথ্যের ধুয়োটাকে কোন্ মিথ্যেবাদী জগতে এনেছিল? তাকে যদি হাতের গোড়ায় পেতাম তা হলে তার মাথাটা ধরে দেয়ালে ঠুকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, এই মিথ্যের আঘাতটা কেমন লাগছে?

* * *

কিন্তু তোমার আবার এ কি নূতন হুজুগ উঠল? তুমিও আবার কাজ-কর্ম্ম ফেলে মাঝে মাঝে ঐ মিথ্যের রাজা সন্ন্যাসীজীটার কাছে ধন্না দিতে আরম্ভ করলে কেন? আমার যে ভয় করছে।

ভয়? হ্যাঁ ভয় বৈ কি। নিজের কাছে গোপন করে দরকার কি? হ্যাঁ আমার ভয় করছে। তুমি অমন করে আজ আমার ঐ বুদ্ধদেবের ছবিখানার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলে কেন? কি দেখছিলে ঐ অপটু হাতের অসম্পূর্ণ শিল্পটার মধ্যে? তোমার ঐ অমন সুন্দর উজ্জ্বল চোখদুটো আজ অমন মরার মত আমার দিকে চাইলে কেন? আজ কেন কোনো আদেশ আমি পেলাম না? কেন আজ তোমার কথার মধ্যে তোমাকে পেলাম না! কোন্ দূর বন-বনান্তরে তুমি আজ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছ? তোমায় যে আজ কিছুতেই সেখান থেকে তুলে আনতে পারলাম না? কেন পারলাম না? কি আমাতে আজ ছিল না? কোন্ বস্তুর অভাবে আজ তোমায় আমার দিকে ফেরাতে পারলাম না? কি নেই আমাতে, তুমি যদি অমনি করে মুখ ফেরাও তা হলে সমস্ত জগৎ যে মুখ ফেরাবে—তা হলে কি নিয়ে থাকবো? আমি যে এখন সব হারিয়ে বসে আছি! শুধু একটী আশায় আমি যে সব আশা ত্যাগ করেছি। এখন মুখ ফেরাও—উঃ! না, তা যে ভাবতেও পারি নে!

* * *

আমি ত' আশা করাই' ছেড়ে দিয়েছিলাম। দিদি যেদিন সব ছেড়ে আশা-কেই আশ্রয় করলে, সেইদিন হ'তে আমি সব ধরে আশাকেই ছেড়েছিলাম, কিন্তু তুমিই ত আশাকে জাগিয়ে দিয়েছ প্রভু! ওগো আমার না চেয়ে পাওয়া ধন, ওগো আমার অকালের মেঘ, আজ যদি তুমি আবার আকাশে মিলিয়ে যাও, তাহ'লে কি করে বাঁচব? না—না—তা পারব না, আমি তা পারব না। তোমায় ফিরতেই হবে। তুমি যখন এসেছ, যখন এ জীবনাকাশে আপনি এসে উদয় হয়েছ, তখন তুমি আমারই। তোমায় আর আমি গোপন হতে দেব না, কিছুতেই নয়। আমার যা কিছু আছে সব দিয়ে তোমায় আমার আকাশে বেঁধে রাখব। একবিন্দু জলও যদি ঐ মেঘ হতে না পড়ে যদি ক্রমাগত বিদ্যুৎ আর গর্জ্জনই শুনতে হয়, যদি বজ্রাঘাতও নেমে আসে, তবু এ মেঘ আর মিলুতে পাবে না। এ মেঘকে আমি আমার সমস্ত কেকা দিয়ে সমস্ত কলাপের বিস্তার করে, সমস্ত কদম্ব ফুটিয়ে ধরে রাখবই রাখব।

* * * *

কিন্তু এত যে জোর করে কাল ঐ কথাগুলো লিখিছি এ জোর আমার থাকছে কৈ? মনে হচ্ছে যেন কোন অজানা দিক্ হতে কেমনধারা যেন হাওয়া বইছে। আমার মেঘমালাও যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার নয়নে যে গভীর ছায়া দেখে এলাম, এ ছায়া কিসের? কার এ ছায়া? এ ছায়া কোথায় ছিল এতদিন?

কি জানি কোথায় ছিল—কিন্তু ছায়া যে জেগে উঠেছে, বাতাস যে লেগেছে আমার মেঘে! কোন্ দিগন্ত হ'তে অজানা আলো এসে আমার মেঘকে রাঙিয়ে তুলছে, দুলিয়ে তুলছে, ফুলিয়ে তুলছে? কিন্তু বর্ষণ হবে কোন্ দিকে, কোন উষর দেশে, কোন মরুপ্রান্তরে? কদম বনের ঘনপাতার ওপরে না শুকনো নদীর বালুর চরে? কোথায় এ মেঘ সরে চল্ল!

মন যে আমার কেঁপে উঠ্ছে—দূরে কি আবার চাতক ডাকছে নাকি? কোথায় গেল আমার কেকা, কোথায় আমার কলাপ! আনো—আনো—সব আন—বাদ্য আন, নৃত্য আন, আন গান, আন ফুল, আন হাসি, আন বাঁশী যা কিছু আছে সব আন—মেঘকে আমার বাঁধতেই হবে। [উপাসনা, ভাদ্র]।

নারায়ণের-নিকষ মণি

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তি তত্ত্বসার—শ্রীরাধানাথ কাবাসী প্রণীত—১ম খণ্ড—৯৬০ পৃষ্ঠা—মূল্য ২।০ টাকা। ইহা দ্বারা বৈষ্ণব জগতের একটী অভাব দূরীকৃত হইল। বৈষ্ণব ধর্ম্মে এরূপ ধরণের পুস্তক আর একখানিও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা গ্রন্থকারের এক অভিনব সৃষ্টি। এই গ্রন্থে বৈষ্ণব গণের ভজন সাধনোপযোগী নিত্য পাঠ্য, নিত্য স্মরনীয় ও নিত্য কীর্ত্তণীয় অনেক বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এই পুস্তক বটতলা বা অন্যান্য স্থানের বৈষ্ণব গ্রন্থের ন্যায় ভ্রম পরিপূর্ণ নহে। ইহা উৎকৃষ্ট কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। তিনি বিপুল পরিশ্রম করিয়া পূজ্যপাদ মহাজনগণের গ্রন্থ সমূহ হইতে রত্ন সকল সংগ্রহ করিয়া একত্রীভূত করিয়াছেন। প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, মনঃশিক্ষা পাষণ্ড দলন, সূচক, পাণ্ডব গীতা, রাসগীতা, জন্মোপবাস ব্রত কথা, রাসপঞ্চা-ধ্যায়ী, বহু সংখ্যক অষ্টক স্তোত্র, ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র, দোঁহাবলী, বৈষ্ণবাভিধান ইত্যাদি অনেক বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান হিতসাধন মণ্ডলী, ধান্যকুড়িয়া, ২৪ পরগণা ও বল্লভ এণ্ড কোং ১০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শ্যামবাজার, কলিকাতা।

আর্ত্ত

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

ভগবান ভগবান!
আর্ত্ত পীড়িত দুর্ব্বল ভীত—
দুঃস্থরে কর ত্রাণ;
কণ্টক বনে বঞ্চক মনে
লয়ে যায় বারে বার,
গ্লানি আর গ্লানি ঘরে তুলে আনি
কঙ্কর ভারে ভার;
বুকে তুঁষ জ্বালি, গায়ে মাখি কালি
চরণে ক্ষতের রেখা,
চরণ চলে না, নয়ন গলে না
একি ভাগ্যের লেখা!
মোহ-মদিরায় প্রাণ যায় যায়
তবুও দীর্ণ প্রাণ,
বুক চিরে চিরে, চিৎকারি ফিরে
জাগায় জীর্ণ জ্ঞান!

ভগবান ভগবান!
পারিনাক আর বহিতে এ ভার
জীবনের অবসান;
পলে পলে মরি অন্তর ভরি
উঠে মরণের ব্যথা,
কেমনে ভুলিব চরণে দলিব
গত জীবনের কথা?
কালানল সম মনানল মম
তুলি লেলিহান শিখা,
ললাটে আমার লিখিল হাজার
মসি-কলঙ্ক লিখা;

কার মুখ চাব সান্ত্বনা পাব
কে এমন গরীয়ান,
পরশে তাহার জীবন আমার
ফিরে পাবে হত মান?

ভগবান ভগবান!
কোথা পথ আছে শুধু আগে পাছে
গর্জ্জিছে অপমান!
আঁধার আঁধার পথ দেখা ভার
স্বন স্বন বহে বায়,—
নীরবতা মাঝে বড় বুকে বাজে
কেঁপে কেঁপে ওঠে শ্বায়,
প্রতি পায় পায় কঙ্কর ঘায়
রক্তের ধারা ছোটে;
পায়ের তলায় মাটি সরে যায়,
দুর্ব্বল দেহ লোটে।
আপনার হাতে রজনী ও প্রাতে
হলাহল করি পান
কেবল যাতনা নাহি সান্ত্বনা
গেল—জ্বলে গেল প্রাণ!

ভগবান ভগবান!
আজি চাহি তব দুর্জ্জয় নব
ভৈরব অবদান;
এস সম্মুখে দাও এই বুকে
তব অস্ত্রের জ্বালা,
তোমার গলার ওই ফণিহার
কার কণ্ঠের মালা,
শেষ করি মোর যন্ত্রণা ঘোর
সারা জীবনের গ্লানি,

তোমার হাতের দিবস রাতের
বেদনারে বড় মানি!
দাও দাও বুকে সব হাসিমুখে
তব বজ্রের দান
চাহি নিষ্ঠুর, এই ভয়াতুর
জীবনের অবসান।
ভগবান,—ভগবান!

জিউজিৎসু

[শ্রীহেম সেন]

অনেকেই জানতে চাচ্ছেন "জিউজিৎসুটা" কি? ইহা একটা জাপানী বিদ্যা। আড়াই হাজার বছরের অধিক কাল থেকে জাপানে এই বিদ্যার চর্চ্চা হয়ে আস্‌চে।

জিউজিৎসুর উদ্দেশ্য শরীরকে সুস্থ সবল এবং স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে, আকস্মিক অথবা অন্য রকমের লৌকিক বিপদ আপদে আত্মরক্ষার এমন কতকগুলি কৌশল শিক্ষা দেওয়া, যাতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং ক্ষীণকায়ও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাহারই শক্তি এবং স্বাভাবিক বা ইচ্ছাকৃত অঙ্গসঞ্চালনের এবং শরীরের ভারকেন্দ্রের চ্যুতির উপর অতি সামান্য শক্তি কৌশল প্রয়োগ করিয়া, এমন অবস্থায় লইয়া যাওয়া, যেখানে বা যে অবস্থায়, সে সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হয়ে যাবে, কিছু করবার শক্তি তার আদৌ থাক্‌বে না। জিউজিৎসুর অনেক কৌশল এম্‌নি দেখ্‌তে কিছুই নয়, মনে হয় বুঝি একজন নিজে ইচ্ছা করেই অন্যের কাছে ধরা দিয়ে থাকে, এবং ঐ অবস্থায় গিয়ে, ইচ্ছা করেই নট নড়ন্ চড়ন্ হয়ে থাকে। কিন্তু একবার পরখ করেই বোঝা যাবে যে ঐ অবস্থায় কেহ স্বইচ্ছায় যেতে চায় না; এবং ঐ অবস্থায় গিয়ে পড়লে কিরকম ভীষণ অকর্ম্মণ্য দশা হয় তাও আর আয়াস করে বুঝ্‌তে হয় না। কখনও একেবারে কোণ ঠাসা অবস্থায় পড়লেও এমনি অদ্ভুত কৌশল অনায়াসে প্রয়োগ করে শক্তিশালী আক্রমণকারীকে এমনই নিঃশক্তি ও অভিভূত করা চলে, যে ফল দেখে বাস্তবিকই নিজেও আশ্চর্য্য হ'তে হয়।

কুস্তী সকলে শিখতে পারে না। কুস্তী শিখতে ভাল স্বাস্থ্য এবং যথেষ্ট শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়। তা'ছাড়া সকলের পক্ষে কুস্তীটা উপযোগীও নয়। কুস্তীতে গুরুতর শারীরিক পরিশ্রম হয়। যেখানে সেখানে তা শেখাও যায় না। জিউজিৎসুতে কখনও গুরুতর পরিশ্রমের সম্ভাবনা নাই, বিশেষ বিশেষ খাদ্য পেয়েরও প্রয়োজন হয় না। জিউজিৎসু কুস্তী নয়।

জিউজিৎসু দুর্ব্বল ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকেরাও অল্পায়াসে শিখতে পারেন। শরীরটাকে জিউজিৎসু শিক্ষার উপযোগী করবার জন্য যে প্রাথমিক ব্যায়ামাদির ব্যবস্থা আছে তাহা শরীরের পক্ষে মহোপকারী। এই ব্যায়াম প্রণালী সর্ব্বত্র অভ্যাস করা চলে। শিশু হইতে বয়স্ক পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষ সবাই ইহা অভ্যাস করিয়া, শরীরকে স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় লইয়া যাইতে পারিবে। ইহা ভিতরে ভিতরে এমনই একটা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেয় যে কখনও আলস্য জন্মিতে পারে না। আলস্যকে আমরা সাধারণতঃ, একটা স্বভাবদোষ বলে ধরে নিলেও উহা যথার্থতঃ শারীরিক রোগ বিশেষ। ঐ প্রাথমিক ব্যায়াম-প্রণালীটার অভ্যাসে শরীরের সকল মাংসপেশী, স্নায়ু এবং সকল আভ্যন্তরীণ যন্ত্র সকল সুস্থ ও সবল হয়ে, স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে বলে, অর্শ ও অজীর্ণদোষমূলক নানা রোগ এবং সকল রকমের স্নায়বিক বিকারজনিত রোগের হাত থেকে সহজেই আত্মরক্ষা করা যায়। ইহা অভ্যাস আরম্ভ করে কয়েক দিনের মধ্যে শরীরে নূতন স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়। এই ব্যায়ামাভ্যাসেও আনন্দ আছে।

আমাদের জাতকে ভিতরে বাহিরে সুস্থ, সবল ও প্রবল করে তুলতে জিউজিৎসুও যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। আমাদের স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, শিশু সকলেরই ইহা শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক পরিবারে, প্রত্যেক বিদ্যাপীঠে বা বিদ্যামন্দিরে এই নির্দ্দোষ, আনন্দদায়ক, মহোপকারী, সহজ ব্যায়াম প্রণালী শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

জিউজিৎসু অভ্যাস করতে কোন যন্ত্রপাতি বা উপকরণের আবশ্যক হয় না কিন্তু শরীরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের দরকার হয়।

জাপানে স্কুল সমূহে প্রত্যেক বালক বালিকাকে জিউ জিৎসু শেখান হয়। জাপানে স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেককে জিউ-জিৎসু শিখতে হয়। বর্ত্তমান জাপান-সম্রাট যখন যুবরাজ, তখন তাঁকেও সাধারণ ব্যায়ামাগারে জিউ জিৎসু শিখতে হয়েছিল। মোটের উপর, জাপানীদের মত এমন সুস্থ আর কোন্ জাত? আর কোন্ জাতের মধ্যে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং বিকার জনিত রোগ এত বিরল?

ইহার মূল কারণ জিউ জিৎসু শিক্ষা। (Jiu-Jitsu) জিউ-জিৎসু ভাল করে শিখতে অন্ততঃ চারি বৎসর সময় লাগে। তবে অল্পকালের মধ্যেই (যেমন তিন চারি মাসে) বাছিয়া বাছিয়া অত্যাবশ্যকীয় কতকগুলি কৌশল শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি তত্ত্ব শিখাইয়া দেওয়া যায় যাহাতে নিয়মিত অভ্যাসে যথেষ্ট সুফল লাভ হইবে।

শুধু হাতের ভিন্ন আর দুই রকম জিউ-জিৎসু আছে, সচরাচর সেগুলির কোন প্রয়োজন হইবে না।

শুধু হাতেরটাই শ্রেষ্ঠ। জিউ-জিৎসু এমনই অদ্ভুত একটি বিদ্যা যে ইহার সম্বন্ধে সকল কথা পত্রে লেখা অসম্ভব!

অমর্কের বিদায়।

[শ্রীঅমর্ক]

দৈত্যপতি আমায় দিয়ে
চলবেনা এ পাঠশালা।
থাকলো পড়ে' বেত্র রজ্জু
থাকলো তোমার আটচালা।
খালি পড়ে' থাকবে কেন!
সমারোহে এবার যেন
খুলে দিও তায় শিশুপাল-
বধ নাটকের নাটশালা।
যে নাম শুনে শ্রবণ রুধে
দারুণ ক্রোধে কাঁপতে থাকো
সে মধুর নাম গলা টিপে
বন্ধ করতে পারব নাকো।
কেবল আপন তোষামোদী
শুনতে এত ব্যাকুল যদি
দেশের যত ভাট জুটিয়ে
না হয় খোলো আটশালা॥

অহঙ্কারে মত্ত তুমি
ভাবছ নিজে অমর বুঝি,
বিশ্বে তারই নেইক মরণ
এক হরিনাম যাহার পুঁজি।
রুদ্রদেবের প্রখর নখর
ছিঁড়বে ভোগায়তন জঠর,
সুরকি হয়ে উড়বে তোমার
বালাখানা আট-তালা।

শিল্প ও স্বদেশী *

[শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার]

স্বদেশী যুগে স্বদেশীর শিল্পের মর্য্যাদা ও শিল্পের আদর্শ আমরা ঠিক বুঝি নাই স্বদেশীর শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজ প্রকৃত দেশের অন্তরাত্মা সচেতন হয়েছে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি ধীরে ধীরে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে; লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধার-কল্পে দেশে শিল্পীও গড়ে উঠছে। তাই বড় আশা হয়, আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর মোহ নিদ্রা সত্য সত্যই টুটেছে, আমরা আবার লুপ্ত রত্নের সন্ধানে উদ্যোগী হয়েছি। আমাদের হৃদয় এবার যথার্থ পথের সন্ধান পেয়েছে, তাই আর সেদিনকার সে অগ্নিময়ী জ্বালা নেই, তৎপরিবর্ত্তে আছে শান্ত, সুদৃঢ়, নির্ভীক কর্ত্তব্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ! যদি আকস্মিক কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা পৃথিবীবক্ষঃ হ'তে অপসারিত হয়, তাহলে ঐ প্রজ্বলিত আলোকস্তম্ভই মনে হয় পুনরায় নবীন সভ্যতার পথ প্রদর্শক হবে।

দীর্ঘ শতাব্দীর অবহেলায় আমরা যা হারিয়েছি তা কেবল ভারতের শিল্পই

* কুমার স্বামীর Art & Swadeshi শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে লিখিত। লেখক।

নয়, ভারতের শিল্পী পর্য্যন্ত ইহাই আমাদের Double loss both physical and spiritual (Havell)। যে ভারত শতবর্ষ পূর্ব্বে সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিল, আজ সেই ভারত হতশ্রী! ভারতের শিল্প অবহেলায় নষ্ট প্রায় হয়েছে। প্রধানতঃ আমাদেরই আত্ম-বিশ্বাসের অভাবে আমাদেরই মোহাবিষ্টতার ফলে। সস্তা বলে ভারতীয় জিনিষ বাজারে চালাবার চেষ্টা ভারতবর্ষ কোনদিন করেনি। ভারতের মস্‌লিন, ভারতের সামগ্রী যেদিন রোমে যেত সেদিন তার আদর ছিল সৌন্দর্য্যেরই জন্য, সস্তা বলে নয়। মুসলমান দিগ্বিজয়ী বীরগণ ভারত লুণ্ঠন করে ভারতের শিল্পই নিয়ে যায়নি, ভারতের শিল্পীও স্বদেশে নিয়ে গিয়েছিল। সস্তার (cheapness) পরিবর্ত্তে সুন্দর বলে (Beautiful) সব সামগ্রী দেওয়া নেওয়ার করার প্রয়োজনীয়তা বুঝ্‌তে হবে। সস্তাই কোন দ্রব্যের একমাত্র গুণ নয়! আমাদের মনে রাখতে হবে Industry without art is Brutality,—প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে কোন ভারতবাসী একথা যেন কোনদিন না ভুলে যায়। সুন্দর কি? চক্‌চকে যা, ক্ষণভঙ্গুর যা, তা সুন্দর নয়—সৌন্দর্য্যের জ্ঞান নেই যার, সেই ওরূপ সৌন্দর্য্যে ভোলে—কাঁচের বাসনের কারুকার্য্য খাগড়াই বাসনের কারুকার্য্যের সমতুল্য হয় না। যার প্রকৃত সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের অভাব সে আবার ফ্যাসান্" বলে যা তা অনুকরণ করে, এখানে বিচার বুদ্ধির সম্পূর্ণ অভাব; বিলাতী অথবা তাহার অনুকরণে দেশী 'এসেন্স' উচ্চমূল্যে ব্যবহার করা চলে, অথচ আতর ব্যবহার করা চলে না! সুন্দর কি? দীর্ঘকাল স্থায়ী, ব্যবহারোপযোগী, হিতকারী এবং যা আমাদের জীবনের সঙ্গে প্রকৃত খাপ খায়, তাই সুন্দর। মূল্যের তারতম্য কোন দ্রব্যের একমাত্র দোষগুণের পরিচায়ক নয়। স্বদেশীয় শিল্পোন্নতি স্বদেশবাসীর পূর্ণসহানুভূতি ও যত্নে পুনরায় গড়ে উঠতে পারে। যাঁরা স্বদেশীর শিল্পোন্নতির বিরুদ্ধে 'সস্তা হওয়া চাই' বলে এখনও ওজর আপত্তি তোলেন ও ক্ষমতার অভাবে শিল্পের উন্নতি করতে পারেন না বলেন, তাঁদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য তাঁরা ক্ষমতা অর্জ্জনের কতটুকু চেষ্টা করেন আর কেনই বা কলেজী পড়া ও কেরানীবৃত্তি করবার মোহ ছাড়তে পারেন না?

শত বর্ষ আমরা কেবল স্বদেশী বর্জ্জন ও বিদেশী গ্রহণের মন্ত্রে যে দীক্ষা গ্রহণ করেছি সে বিষবৃক্ষের বিষফল একেবারে ত্যাগ করতে পারব কেন? মানুষ চোখ মেলে আজ যে কাজ করে বসে, কাল চোখ বুজে তা ভোলবার যত চেষ্টাই করুক না কেন, কর্ম্মফল একদিন না একদিন পূর্ণ হয়ে সুদখোর মহা-

জনের মত তার প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবে! আমরাও উনবিংশ শতাব্দীর মোহভঙ্গের পর স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জনের ব্রত গ্রহণ করে ছিলাম—কিন্তু সহসা স্বদেশী ব্রতের মর্ম্ম দেশবাসী উপলব্ধি করতে না পারায় (অথবা দেশের sentimentalism টুকু চতুর ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ে ভাঙিয়ে নেবার ফলে) "স্বদেশী" নাম নিয়ে এলুমিনিয়মের বাসন' থেকে মিলের কাপড় পর্য্যন্ত স্বদেশে প্রস্তুত করতে যত "লিমিটেড কোম্পানী" হয়েছে ততই তার সেয়ার কিন্‌তে দেশের লোক সঞ্চিত অর্থ কলকাতরে ঢেলে দিয়েছে—ঐ বিদেশীরই মত ফ্যাক্টরী করে, দেশের দরিদ্রকে কৃতদাস wage-slavs করে প্রচুর ডিভিডেণ্ট লাভ করবার উদ্দেশ্যই তার মূল প্রেরণা ছিল এবং এখনও যে নাই এরকম বলা চলে না। এর নাম যদি 'স্বদেশীর ব্রত গ্রহণ' হয় আর নির্ব্বিচারে 'বিদেশী সভ্যতা' গ্রহণ যদি 'বিদেশী বর্জ্জন' হয়, তবে আমাদের Boycottএর আন্দোলন যথার্থই হাস্যকর এবং সে "স্বদেশীর" দীক্ষা গ্রহণ বিফল হয়েছে। এলুমিনিয়মের ব্যবসায়ীর উচ্চ ডিভিডেণ্ট লাভ দেখে আর স্বদেশী মিলের উন্নতি দেখে যদি স্বদেশীর উন্নতি বুঝতে হয়, তাহ'লে সে উন্নতিতে আমাদের হৃদয় আরও হীন হয়ে পড়েছে এবং সেই ভাবে স্বদেশীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেছে। এবং সেই জন্যই মনে হয়, যে কারণেই হ'ক দেশের যতগুলি যৌথ কারবার ফেল্ হয়েছে সেগুলি দেশের মাটীতে কোনমতে টিকে থাকতে না পারাতেই বিনষ্ট হয়েছে—তাহাতে বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশের জনসাধারণ দরিদ্র ও মৃতকল্প হলেও ইউরোপীয় ফ্যাক্টরীর অনুকরণে আজও কৃতদাস হয়ে ওঠেনি। তারা মানুষ, মানুষের ডাকে আবার সাড়া দিয়েছে, চাবুকের শাসন তারা গ্রাহ্য করেনি।

আমরা তো কোন দিন বৃহৎ ভাবে চেষ্টা করিনি স্বদেশের তাঁতির উন্নতি কেমন করে হয়, কামার বাসন ব্যবসায়ীর জাত-ব্যবসায় কেমন করে রক্ষা হয়; নির্ব্বিচারে 'বিদেশী গ্রহণের' ফলে আজ প্রায়শ্চিত্তের দিন এসেছে, তাই নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যও হারিয়ে বসেছি—দেশে আর শিশুর খাদ্য গোদুগ্ধ মেলে না, শিশিভরা 'বিলিতী ফুড্' উচ্চমূল্যে কিন্‌তে হয়; উচ্চমূল্যে বসন-ভূষণ সবই কিন্‌তে হয়—নইলে 'ভদ্রস্থতা' রক্ষা হয় না। প্রতিকারের প্রশ্ন উঠ্‌লে তাঁরা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন আর প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের কথায় তাঁরা উপহাস করেন।

আমার মূল বক্তব্য এই যে, স্বদেশী শিল্পের উন্নতিকল্পে এমন কি 'নির্ব্বিচারে'

স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন ভাল নয় অর্থাৎ আমাদের যেটুকু গ্রহণ ও বর্জ্জনের ক্ষমতা সেইটুকু বিচার করে নিতে হবে। নির্ব্বিচারে 'স্বদেশী স্বদেশী' করে একটা উন্মাদনায় মেতে স্বদেশীর উদ্দেশ্য বিফল হয়েছে। "'মিলের' পরিবর্ত্তে চরকা ও তাঁত যদি গত পনর বৎসর ধরে চল্‌ত, আমাদের বস্ত্রাভাব নিশ্চয়ই ঘুচত। আমাদের বস্ত্রাভাবই পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়েছে এমন নয়, আমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাবও পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়েছে; তাই আজ যাঁরা বক্তৃতার তোড়ে মুখে বলেন, "বিলিতী কাপড় পরা অপেক্ষা উলঙ্গ থাকা ভাল" তার উত্তরে তাঁদের স্বয়ং সে ত্যাগের আদর্শটুকু প্রদর্শন করতে বলি না, আমার এই আক্ষেপ হয় "দেশের সে মনের জোর আজ কোথায়?"

স্বদেশীর জোয়ার-ভাটা আমাদের জীবন-নদীতে এমন বার বার আসবে; কিন্তু এবার এ ভাবের জোয়ারে তর্ক করে বিচার করে নৌকা ভাসাতে হবে। নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাক্‌লেও নিস্তার নেই কর্ম্ম করতে হবে; কিন্তু তার পূর্ব্বে পথের সন্ধান সুনির্দ্দিষ্ট হওয়া চাই।

অতএব আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করতে হবে। "No lovely things can be produced in conditions that are themselves unlovely." আমাদের বর্ত্তমান সব নগর Birmingham কি Parisএর suburb বলে নাকি অনেকের ধারণা হয়; সুতরাং এরূপ ধারণার পরিবর্ত্তে যাহাতে বারাণসী অথবা যে কোন পবিত্র হিন্দু নগরীর আদর্শে পুনরায় ভারতীয় নগরের প্রতিষ্ঠা হয় তাহা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সেদিন দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিটিশ গায়না হ'তে একটী ডেপুটেশন ভারতবর্ষে এসেছিল—তারা চায় শিক্ষিত ভারতবর্ষকে সে দেশে নিয়ে যেতে; সেই ডাক পেয়ে শত শত ইংরাজ শিক্ষিত যুবক স্বদেশ ছেড়ে সে দেশে যাবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে আবেদন করেছেন। তাতে East and Westএর মিলন হয়েছে বলে যাঁরা উৎফুল্ল হতে চান, তাঁদের 'কবির স্বপ্ন' ভাঙ্‌তে আমি ইচ্ছুক নই। আমাদের একটা আত্মনির্ভরতার একান্ত অভাব এতে প্রকাশ হয়ে পড়ছে নাকি? কিন্তু আমার বিশ্বাস, দেশের মধ্যে নূতন নূতন Settlement গড়বার ডাক পড়লে আমরা প্রকৃত পথের সন্ধান পাব। যে ভুলে বিগত শতাব্দীতে ভারতবর্ষ তার শিল্প-বাণিজ্য হারিয়েছে, ভারতবর্ষের শিল্পী তার সাধনা, অধ্যবসায় ভুলেছে, সেই ভুল আবার বিংশ শতাব্দীতেও আমরা করব কি? আমরা স্বহস্তে পূর্ব্বপুরুষদের সযত্নে রোপিত বিষবৃক্ষের

ফল পেড়ে সেই বীজ কি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য পুনরায় রোপণ করে যাব? অতীত ভারতকে আদর্শ করে তার জ্ঞানবিকাশের ঐশ্বর্য্য যা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েও আমরা আজ হারিয়ে বসে আছি, তাই পুনরুদ্ধার করবার উপায় ভবিষ্যৎ ভারতকে আমাদের স্পষ্ট করে দেখিয়ে যেতে হবে। জগৎকে নিমন্ত্রণ করবে ভবিষ্যৎ ভারত; বর্ত্তমান ভারত একমুঠা অন্নের কাঙাল, একখণ্ড বস্ত্রের অভাবে লজ্জাহীনা—অতিথি সৎকার ভারত করতে জানে কি না, হৃদয়বান অতিথি বদ্ধদ্বার দেখেই আশা করি বুঝতে পারবেন। 'ভুখা ভারতের' বিশ্বের ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা প্রলাপ মাত্র। যদি তা অস্বীকার কর, বল, 'বিশ্বকে দেবার ভারতের এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে,' তা হ'লে স্পষ্ট করে বল কি আছে? বিশ্বের বিরুদ্ধে ভারত আজ বিদ্রোহ করবে, এক লাঞ্ছিত প্রাচীন জাতি কেন তার সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যার লব্ধ 'মৃত সঞ্জীবনী' জগৎকে ঘরে ডেকে এনে অতিথি সৎকার বলে বিলিয়ে দেবে? কোন্ অধিকারে তারা উপনিষদ নিতে আসবে? সেখানে তো তাদের Lewis gun, rifleএর অধিকার নেই! তবে সমস্ত ভারত অতিথিকে কি প্রত্যাখ্যান করবে? ভারতের কবি কি সমস্ত ভারতের সঙ্গে পরামর্শ করে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন? তবে তিনি স্বয়ং মুক্ত আকাশতলে অতিথিসৎকার করুন—ভারতকে আর নূতন লাঞ্ছনা যেন না দেন!

আমাদের বর্ত্তমান হীনাবস্থার জন্য দায়ী আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা ও আমাদের আত্মশক্তির উপর অনাস্থা, অতএব আমাদের শিক্ষা নূতন আদর্শে গড়ে তুলতে হবে; আমাদের পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের মোহ যতদিন থাক্‌বে আমাদের শিল্পবাণিজ্যের পুনর্গঠন ততদিন অসম্ভব থাক্‌বে।

আমাদের শিল্পোন্নতির ইতিহাস বহুশতাব্দীর ক্রমবিকাসের ফল। সমাজের যে অবস্থায় তা সম্ভব হয়েছিল সে অবস্থা সত্য সত্যই আর নাই। কিন্তু ফ্যাক্টরী গড়ে এদেশে শিল্পোন্নতি করা চল্‌বে না, গত পনর বৎসরের যৌথ-কারবারের ইতিহাস তার অন্যতম কারণ। এযুগে কেমন করে নূতন ভারতীয় নাগরিক জীবন ও সামাজিক গ্রাম্যজীবন পুনর্গঠিত করা যায়, আমাদের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা ও সাধনার বিষয়—'স্বরাজ বা স্বাধীন রাষ্ট্রীয় জীবন সেই নব জীবনকে রক্ষা করবারই বাহিরের উপায় মাত্র। প্রথমটা আমাদের যতটা চিন্তার বিষয় দ্বিতীয়টা তত নয়, তার কারণ প্রকৃত পক্ষে যখন আমরা প্রথমটা লাভ করব দ্বিতীয়টা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাধীনতা আপনা আপনি আসবে।

নূতন নাগরিক সভ্যতা গড়তে ভারতীয় শিল্পীর ডাক প্রথমেই পড়বে। সেই নূতন সৃষ্টির অন্তরালে যে শিক্ষা সমস্ত জাতিকে অনুপ্রাণিত করবে সে শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে হ'বে ভারতীয় শিল্পের প্রাণের কথা; সেই নষ্ট শিল্প উদ্ধারের জন্য বীরের মত সাধক চাই—দুর্গম পথ, ধীরে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে অগ্রসর হতে হবে। শতাব্দী পরে ভবিষ্যৎ ভারতে যে নূতন মন্দির নির্ম্মিত হ'বে তা দেখ্‌তে ভারতের নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে কিন্তু সেই মুক্ত মন্দিরদ্বারে অতিথি হবে। উৎসবের সেই দিন। সে কর্ম্মের সফলতা প্রাপ্তির আশা আমাদের জীবিত কালে বর্ত্তমান ভারতকে ত্যাগ করতে হবে। কর্ম্মের পথে আমরা দলে দলে অগ্রসর হ'লে কর্ম্মফল-ভগবৎকৃপায় আস্‌বেই আসবে।

আমাদের শিল্পের প্রাণের কথা কি? আমাদের সভ্যতার বিকাশ ও প্রচার যুগে যুগে, স্বদেশে ও দেশান্তরে ঐ শিল্পের ভিতর দিয়ে ঘটেছিল। শিল্পজ্ঞানই সৌন্দর্য্যজ্ঞান এবং শিল্পের অভাবে সৌন্দর্য্যহীন মানুষের জীবন দিনে দিনে শুকিয়ে যায়—ভারতবর্ষের মত মহাদেশে একটা মহাজাতির জীবন এমনই করে একটি শতাব্দীতে শিল্প-সৌন্দর্য্য হারিয়ে শুকিয়ে গেছে। সর্ব্বাগ্রে সেই মুমূর্ষপ্রাণে এই সৌন্দর্য্যজ্ঞানের উন্মেষ হওয়া চাই। ভারতীয় শিল্পের অন্বেষণের পূর্ব্বে ভারতীয় শিল্পীর অন্বেষণ আবশ্যক। স্বজাতীয় শিল্পের যত্নের অভাবে আজও তারা বিজাতীয় শিল্পের চর্চ্চা নিয়ে আছে অথবা জীবিকা নির্ব্বাহের কৃষিকর্ম্মাদি অবলম্বন করে বেঁচে আছে। অতএব নূতন ব্রতী যারা তাদের ঐ ভারতের যে সমস্ত শিল্পী আজও জীবিত, যারা বরোদা প্রভৃতি হিন্দু রাজ্যেও পাশ্চাত্য অনুন্নত শিল্পের অনুকরণে হিন্দুরাজার নগরের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে অথবা অন্য উপায়ে কোনরূপে জীবিকানির্ব্বাহ করে সেই সব শিল্পীকে ডাক দিতে হবে; লুপ্তপ্রায় ভারতের গৌরব সেই উন্নত শিল্পের পুনর্গঠন করতে এই সব পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকৃষ্ট শিল্পের কেন্দ্র অসুন্দর সহরগুলি হ'তে স্থানান্তরে সরে যাওয়া চাই। আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের শিল্প ঐরূপ নূতন কেন্দ্রে সৌন্দর্য্যের মধ্যে স্থাপিত না হ'লে সে শিক্ষার ফলও সুন্দর হবে না। সেই দিন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর মত একাধিক বিজ্ঞানমন্দির এই অসুন্দর নগরের পরিবর্ত্তে 'সুন্দর' নগরে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে নব নব শিল্পী ও সাধকের পথ নির্দ্দেশ করবে। কবির 'বর্ষামঙ্গল' সেই সুন্দরের মধ্যে যথার্থ সুন্দর হ'য়ে ফুটে উঠ্‌বে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে সভ্যতা আমাদেরই আশ্রয় করে আজ বলদৃপ্ত হয়েছে, সেই সভ্যতা আমাদের সহযোগীতা হারিয়ে inferior environmentsএর

মধ্যে ক্রমশঃ একটা শতবর্ষব্যাপীকালের মুর্শিদাবাদের মত সমস্ত বাণিজ্যগৌরব নিয়ে অচিরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এ যুগে East and Westএর অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন হ'ক বা না হ'ক, সে আমাদের বড় চিন্তা নয়। এণ্ড্রুজ সাহেব সেতার বাজান কিনা আর রবিবাবু হারমনিয়ম বাজান কিনা সেটা এযুগের বড় স্মরণীয় ঘটনা নয়। আমাদের চিন্তা এই, আমাদের জাতীয় জীবনের সৌন্দর্য্যের আরাধনা অর্থাৎ লুপ্তপ্রায় শিল্পগৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা—মানুষকে শুধু 'lever of art হ'লে চল্‌বে না, 'art of living'ও শিখতে হবে। বাঁচার মত বেঁচে থাকতে হ'লে জীবনের মাঝে সৌন্দর্য্যের সাধনা চাই। মানুষ মানুষের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে শিখ্‌লে, তার অপর কোন শিক্ষার আবশ্যকতা আছে কিনা জানিনা।

আমাদের জীবিতকালে যে কর্ম্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করে যেতে হবে তা পূর্ণ করতে যুগযুগের সঞ্চিত বিশাল চিন্তা, অসম্ভব স্বপ্ন ও বিজ্ঞের উপেক্ষিত Sentimentalism নিয়ে বহু artist বহু শিল্পী চাই; সহস্র সহস্র বৎসরের সঞ্চিত ভারতীয় কল্পনা সৌন্দর্য্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে আমাদের এই নূতন সাধনা, নূতন চিন্তা, নূতন স্বপ্নসৃষ্টির অন্তরালে যে আদর্শ নিয়ে কর্ম্মমন্দির রচিত হবে, কত যুগযুগান্ত পরে ঐ কল্পনার সৌন্দর্য্য নব নব আদর্শে রূপান্তরিত হয়ে শত শত অজন্তা, সহস্র সহস্র তাজমহল, লক্ষ লক্ষ সাধক-শিল্পী ভারতবর্ষে আকার গড়ে তুলবে। ভারতবর্ষ সেদিন আবার যথার্থ সৌন্দর্য্যের সাধক হয়ে "সোনার ভারত" বলে জগদ্বিদিত হবে।

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা] [অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ সাল।

ভারতের আহ্বান

[শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ]

ভারতের যে বাণী—সে বাণী সমস্ত পৃথিবীর। ভারতে যে নবীন জাতি গড়ে উঠছে, তারা সে বাণী পৃথিবীর মধ্যে প্রচার করবে—তার জন্য ভারতের ইতিহাস অপেক্ষা করছে, তার জন্য যুগশঙ্খ বেজে উঠেছে। তারি জন্য বুঝি স্পষ্ট করে দেখতে পাবে কি না পাবে সকলে আজ ছুটে আসছে। আমাকে ভারতের ইতিহাস ডেকেছে। যুগশঙ্খ বেজে উঠেছে—সে শঙ্খধ্বনি তোমার প্রাণকে স্পর্শ করেছে, তাই তুমি ছুটে এসেছ। আমি কেহ নই। আমি কে? আজ আমি সামান্য কর্ম্মমাত্র—তোমাদের সেবক,—তার বেশী অহঙ্কার আমার নাই। তোমাদের সেবায়—আমার স্বদেশবাসীর সেবায়—আমি আজ কর্ম্মে নিযুক্ত। কাল হয়ত ভগবৎ কৃপায়—এমন অবস্থা হবে——আমি আর সে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকতে পারবো না। আমাকে এখনই হয়ত তিনি অন্য কোন জায়গায় সরিয়ে নেবেন; নয়ত আমাকে মরণের দেশে যেতে হবে।

এই যুগধ্বনি তোমাদের প্রাণে বেজেছে! একবার ধ্যান কর—একবার চোখ বুজে মনের মধ্যে চক্ষুকে তাড়িত কর—দৃষ্টিকে পাতিত কর, তখন দেখতে পাবে কি? দেখতে পাবে শুনতে পাবে কি? যা দেখবে তাই শুনতেও পাবে। মনের মধ্যে যে স্বাধীনতার আলোক ধীরে ধীরে জ্বলে উঠছে—সেটা দেখবার জিনিষ—সেটা শুনবার জিনিষ—সেটা বুঝবার জিনিষ।